৩৮ বর্ষ • ১ম সংখ্যা • জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আসুন, কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি	আশীষ লাহিড়ী	৩
অশোক স্মারক বক্তৃতা	অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	৬
স্মারক বক্তৃতা প্রতিবেদন	পূরবী ঘোষ	১২
স্মারক বক্তৃতা ছবি		১৩
ওআরএস আবিষ্কর্তা	সাক্ষাৎকার	১৪
রাজ্যে খুচরো ব্যবসা	শৈবাল কর	১৯
পাহাড় অভিযান অসুস্থতা	গৌতম মিস্ত্রি	২৩
স্কুলপাঠ্যে বাংলা	ভূপতি চক্রবর্তী	৩০
বরফ বিতর্ক	অরুণালোক ভট্টাচার্য	৩৩
ই-বর্জ্য	নন্দগোপাল পাত্র	৩৭
অন্ধকারের উৎস	পূরবী ঘোষ	৩৯
সংগঠন সংবাদ		৪০

সম্পাদক
সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস: বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয়
খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন
বি ৪ ও ৫, এস- ৩, নারায়ণপুর
পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০১৩৬
ফোন: ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/
৯৮৩১৪৬১৪৬৫
ওয়েবসাইট :www.utsamanush.com
ই মেল: utsamanush1980@gmail.com

অদ্ভুত আঁধার এক...

২১ জানুয়ারি সংবাদপত্রের প্রথম পাতার খবর– 'থানার কাছে গণধর্ষণ, ধৃত ৩ নাবালক-সহ ৬'। ঘটনাটি ঘটেছে দিনেরবেলায় এবং কলকাতার কাছেই তারাতলায়। ধর্ষণ ব্যাপারটা এখন জলভাত। গোটা দেশেই। তা নিয়ে নতুন করে আলোচনার কিছু নেই। যেটা নিয়ে আমরা বেশি উদ্বেগে, তা হল নাবালকদের এই 'বিনোদনে' অংশ নেওয়া। দিল্লির সেই নির্ভয়া কাণ্ড থেকেই বিষয়টা সামনে চলে এসেছে। অথচ আমাদের এ নিয়ে কোনো হেলদোল নেই। কোন আইনে ওদের বিচার হবে, ওদের সাবালক হিসাবে ধরা হবে কিনা, এই সব নিয়ে কূটকচালি চলছে। সত্তর-আশির দশকে ব্লু ফিল্ম কথাটা শোনা যেত, কিন্তু কজন তা দেখেছে, হাতে গুনে বলা যেত। প্রযুক্তি বিপ্লব বিষয়টাকে আক্ষরিক অর্থেই হাতের মোয়া করে তুলেছে। ফোন, কম খরচে অফুরান তার ব্যবহার, ইন্টারনেট, ইউটিউব, ফ্রি ওয়াইফাই, সর্বোপরি মোবাইল ক্যামেরা– রসদ নাগালেই। রাস্তাঘাটে একটু চোখ-কান খোলা রাখলেই চোখে পড়ে, বালকের দল এখন বল নিয়ে পেটানোয় নয়, মোবাইল নিয়ে আগ্রহী বেশি। শুধু দেদার পর্নো ভিডিও দেখাই নয়, মোবাইল ক্যামেরার দৌলতে নিজেদের নানা কাণ্ডকারখানা তারা আনন্দে ভিডিও করেও ফেলছে। তাদের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে তা ছড়িয়ে পড়ছে অন্তর্জালে। বান্ধবীকে লুকিয়ে বা তার সম্মতিতেই তোলা হচ্ছে যৌনকর্মের ভিডিও। এমনকি স্বামী-স্ত্রীও। ইন্টারনেটে এই ধরনের ভিডিওর কদর পেশাদারদের তোলা ভিডিওর থেকে বেশি। বয় ফ্রেন্ডের

পরের পাতায়

বইমেলায় **উৎস মানুষ**
স্টল নং ৪০৭
লিট্‌ল ম্যাগাজিন প্যাভেলিয়নের সামনে
৩১ জানুয়ারি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি

আবদারে গার্লফেন্ড তার পোশাক ছাড়ার ভিডিও করে পাঠাচ্ছে। ভাবুন কাণ্ড! (টাইমস অভ ইন্ডিয়ায় সম্প্রতি এ নিয়ে এক সমীক্ষার খবরও বেরিয়েছে। ছেলেদের নাকি এটি এখন প্রিয় আবদার)। আমরা,বাবা-মায়েরা নিজেদের চাকরি এবং ব্যস্ততা, তার মধ্যে নিজেদের হোয়াটস অ্যাপ এবং ফেসবুকও আছে, নিয়ে মত্ত। সবেধন নীলমণি ছেলেমেয়েকে সামান্য মোবাইল কিনে দিতে পারব না! সময় ও মনোযোগ দিতে না পারলেও দুজনের রোজগারে ওদের আকাশের চাঁদও ধরে দিতে পারি। এক পরিচারিকা দিদি বলছিলেন, তাঁর সিক্স-সেভেনে পড়া নাতি মোবাইল কিনে দেওয়া নিয়ে এমন অশান্তি করছিল, যে তাকে কিনে দিতেই হয়েছে। পরিণতি আরও কত খারাপের দিকে যায়, তা দেখার জন্য আমরা নীরবে শবরীর প্রতীক্ষায়।

২১ জানুয়ারিই এক ইংরেজি কাগজের প্রথম পাতার খবর– সাগরে এবার কম করেও ৫১জন বৃদ্ধবৃদ্ধাকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। 'বিসর্জন'-এ মাসি তাঁর বোনপোকে রেগেমেগে বলেছিল– 'চল তোকে দিয়ে আসি সাগরের জলে।' রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা-কাহিনী সবার পড়া। এখানে মাসি নয়, সুপুত্তুরের দল। তীর্থ করাতে নিয়ে গিয়ে ফেলে রেখে চলে আসছে। বেড়াল ছেড়ে দিয়ে আসার মতো কখনও বারাণসীতে, কখনও গঙ্গাসাগরে বাবা-মাকে ছেড়ে আসছি, এর চেয়ে পুণ্যের কাজ আর কি হতে পারে! ওই সব জায়গায় মরলে তো স্বর্গে যাওয়া অবধারিত!

যে সে বিভাগের মন্ত্রী নন সত্যপাল সিং। কেন্দ্রের মানবসম্পদ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রশ্ন তুলেছেন, কেউ কি দেখেছে বাঁদর থেকে মানুষ হতে? সত্যপালকে অশিক্ষিত বলার জো নেই। একদা আইপিএস ছিলেন। সারা ভারত বৈদিক সম্মেলনে বলেছেন, ছোট থেকে এমন কোনো বই পড়েননি বা দাদু-ঠাকুমার মুখে শোনেন নি যে, বাঁদর থেকে মানুষের উদ্ভব। অতএব ডারউইনের তথ্য একেবারেই ভুল। যে দেশের এমন মানবম্পদ মন্ত্রী, সে দেশ কোন দিকে এগোচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে। তবে সত্যপালজি গরুকে যে নির্দ্বিধায় মা বলে স্বীকার করবেন, তা চোখ বুজে বলে দেওয়া যায়।

আসি বইমেলার কথায়। কলকাতা ময়দান থেকে সরিয়ে মেলাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বাইপাসের ধারে মিলনমেলায়। এবার সেখান থেকে উৎখাত হয়ে চলেছে সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে। গিয়ে এবং যেতে গিয়ে সেখানে কী অব্যবস্থার মধ্যে পড়তে হবে কে জানে! ময়দান যে বইমেলার পক্ষে শ্রেষ্ঠ জায়গা ছিল, তা নিয়ে দ্বিমতের জায়গা নেই। কিছু লোকের এখন দূষণ-দূর্বলতা তৈরি হয়েছে। বইমেলা হলে নাকি ময়দান এত দূষণজর্জর হয়ে পড়বে, তা কহতব্য নয়। এদিকে বিনা বইমেলাতেই কলকাতা দিল্লির সঙ্গে দূষণে পাল্লা দিচ্ছে। কোনো দূষণ-বিপ্লবী এ নিয়ে আন্দোলন করছেন না যে, রাস্তা থেকে গাড়ি কমাতে হবে। ব্যক্তিগত গাড়ির বদলে অনেকে চড়ার গাড়ি, যাকে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বলে, তাতে জোর দিতে হবে। আর তা বলবই বা কোন মুখে। আমরা তো রাজ্যে গাড়ির কারখানা হল না বলে দুঃখে মরে যাচ্ছি। সস্তায় গাড়ি কিনতে না পারার আক্ষেপ যাচ্ছে না। মোটরসাইকেল তো ঘরে ঘরে। এটি ছাড়া তারুণ্য সম্পূর্ণ হচ্ছে না। গাড়ি চলার রাস্তা আছে। তার সিংহভাগই অন্য কাজে ব্যবহৃত। হাতিবাগান থেকে গড়িয়াহাট– কলিকাতা চলিতেছে নড়িতে নড়িতে। মহানাগরিক অবশ্য ফুৎকারে দূষণের কথা উড়িয়ে দিয়েছেন। আমাদের ঘাড়ে অতিরিক্ত মাথা নেই, অতএব চুপ করে থাকাই শ্রেয়।

যাই হোক, বইমেলায় এবারেও আমরা আছি। শুধু বই বিক্রি নয়, বহু পাঠকবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়, তাদের মূল্যবান মতামত জানতে পারি। এটাই মস্ত প্রাপ্তি। উৎস মানুষ পত্রিকায় 'আহরণ' শীর্ষক যে লেখাগুলো বেরোত, তা নিয়ে সঙ্কলন প্রকাশ করার পরিকল্পনা আছে। কাজও চলছে। বইমেলাতে হয়ত পাঠক হাতে পেতেও পারেন। বন্যা নিয়েও একটা সঙ্কলন প্রকাশের অপেক্ষায়। আমাদের বইয়ের এখনও ভাল চাহিদা আছে। ফলে পুরনো বইগুলো নতুন করে ছাপানোর প্রয়োজন পড়ে। টাকাপয়সার টানাটানিতে নতুন বই করা হয়ে ওঠে না। তবু বইমেলায় একটা নতুন বই পাঠকের হাতে তুলে দিতে চাই। দেখা যাক।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা এবার ছিল নবম বর্ষে। বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম কর্তৃপক্ষ শুধু প্রেক্ষাগৃহ দেওয়াই নয়, নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমরা কৃতজ্ঞ। শ্রোতাদের দিক থেকেও খুব ভাল সাড়া পাওয়া গিয়েছে। অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বয়সকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে ওঁর স্বভাবসুলভ সরস ভঙ্গিতে জ্যোতিষ কেন বিজ্ঞান নয়, তা জানিয়েছেন। উনি উৎস মানুষ পরিবারের বরিষ্ঠ সদস্য। ওঁকে ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নেই। রাজশ্রী ভট্টাচার্য ওঁর পেশাদারি ব্যস্ততা সরিয়ে আবার স্মারক বক্তৃতায় গান শুনিয়ে গেলেন। ওঁকেও ধন্যবাদ।

উমা

আসুন, কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি

আশীষ লাহিড়ী

(৩)

১. রবীন্দ্রনাথের রচিত শ্যামাসঙ্গীত

বাজারে জোর গুজব, রবীন্দ্রনাথ নাকি শিক্ষিত বাঙালিদের ঘাড়ে গ্যাঁট হয়ে চেপে বসে আছেন। হবে। প্রায় গুটি বত্রিশ গানের যে-বিশাল সম্ভার ভদ্রলোক রেখে গেছেন, তা বাঙালি ভদ্রলোকরা সুরে-বেসুরে রপ্ত করে রেখেছেন। সেগুলো দিনে দুপুরে বাঁধ-ভাঙা চাঁদের হাসির বান ডাকিয়ে ট্রেজার আইল্যান্ডে— সরি, ট্রাফিক আইল্যান্ডে— বাজে করুণ সুরে। শোনা যাচ্ছে, ভানুসিংহর বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণে অচিরে শোনা যাবে অতনুবান্ধবের ভোজপুরি গদাবলী। রবীন্দ্রনাথের দু-একটা গপ্পটপ্পর খবরও বাঙালিরা সিনেমাটিনেমা, সিরিয়ালটিরিয়ালের দৌলতে রাখেন। তাছাড়া অনেক টাকা ইনভেস্ট করে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যে-বিখ্যাত পর্যটন-কেন্দ্রটি বানিয়েছিলেন, যেখানে পৌষমেলা আর বসন্ত-উৎসবে সুন্দরী মেয়েরা লাঠি ঠকঠকিয়ে নাচে, সেখানেও তাঁদের নিত্য আনাগোনা। সেখানে সমাগত ঐতিহ্য-সচেতন বাঙালিরা দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পথ অনুসরণ করে প্রচুর বোতল সঙ্গে রাখেন। উৎসব শেষে পশ্চাৎ উল্টে পড়ে-থাকা বোতল সরানোর কাজ নাকি পশ্চিমবঙ্গের বেকারসমস্যা দূর করার কাজে লাগছে। কাজেই, সন্দেহ কী, রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি।

এত রবীন্দ্রপ্রীতির মধ্যে কিন্তু একটা বিরাট খামতি রয়ে গেছে। ভদ্রলোকের পদবি ঠাকুর, লোকটি ঈশ্বরবিশ্বাসীও বটেন, অথচ মা কালীর নাম শুনলেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। চোখের সামনে নজরুলকে দেখেও শিক্ষা নিলেন না তিনি, লিখলেন না একটিও শ্যামাসঙ্গীত। মা দুগ্গাকে তবু বাঙলাদেশের হৃদয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে এক রকম করে ম্যানেজ করে দিয়েছেন তিনি। বাল্মিকী প্রতিভাতে 'নমি নমি ভারতী' বলে সরস্বতী-বন্দনাও করেছেন। কিন্তু কালী? নৈব নৈব চ। আসলে ফরসা রঙের মহিলাদের প্রতি ভদ্রলোকের একটু দুর্বলতা ছিল; কেবল ময়নাপাড়ার কৃষ্ণকলিকে 'কালো, তা সে যতই কালো হোক' বলে ক্ষমাঘেন্না করে নিয়েছিলেন। কিন্তু ওই অব্দিই। বাঙালি হিন্দুর পরমারাধ্য কালো মেয়ের পায়ের তলায় কোনোদিন তো আলোর নাচন দেখতে পেলেন না তিনি! কত বড়ো একটা মার্কেট হেলায় হারালেন। সেই রাগেই হয়তো তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান বীরভূমের কোনো মার্কেট-সচেতন ভক্ত তাঁর নোবেল-মেডেলটি গাপ করে শোধ তুলেছেন।

সত্যিই তো, সুয়োগ পেলেই কারণে-অকারণে তিনি কালীদেবীকে গালমন্দ করেছেন। কুড়ি-বাইশ বছর বয়সে বাল্মিকী প্রতিভাতে মা কালীর ডাকাত-ভক্তদের নিয়ে কী ব্যঙ্গটাই না করেছেন, ভাবুন। একটা উদাহরণই যথেষ্ট জ্ব

> ত্রিভুবন-মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয় —
> মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়।
>
> তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয় —
> তবে ঢাল সুরা, ঢাল সুরা, ঢাল ঢাল ঢাল।
> দয়া মায়া কোন ছার, ছারখার হোক।
> কে বা কাঁদে কার তরে, হাঃ হাঃ হাঃ।

একটু বয়স হবার পর লিখলেন বিসর্জন। সেখানো তো আর এক কাঠি এগিয়ে গিয়ে কালীমূর্তির পিছন দিক দেখিয়ে তাকে অপমান করলেন। (সত্যজিৎ কি 'দেবী'র শেষ শটটির প্রেরণা ওখান থেকেই পেয়েছিলেন?) বিশ্বাস না হয়, বিসর্জনের তৃতীয় অঙ্ক-র 'মন্দির' অংশ দেখুন।

> **রঘুপতি ।। তবে তোরা দেখবি? এইখানে আয়। অনেক দূর থেকে অনেক আশা করে ঠাকরুণকে দেখতে এসেছিস, তবে একবার চেয়ে দেখ্।**
> **মন্দিরের দ্বার-উদ্‌ঘাটন। প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ দৃশ্যমান।**

প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ দৃশ্যমান করেই ক্ষান্ত নন তিনি। নাটকের শেষে রঘুপতি প্রায় গব্বর সিংয়ের মতো শক্তি দেখিয়ে একা হাতে মা কালীর মূর্তি তুলে নিয়ে 'দূরে গোমতীর জলে' ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এ তো রীতিমতো কালাপাহাড়ি কাণ্ড।

পাঁঠাবলির মতো নিরীহ প্রথা নিয়েও তাঁর ঘোর আপত্তি ছিল। ১৯৩৫ সালে কালীঘাটে পশুবলি বন্ধ করবার জন্য রামচন্দ্র শর্মা নামক এক ভদ্রলোক অনশন আরম্ভ করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কবিতা লিখে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কবিতার শেষ লাইনগুলি এইরকমঃ

নিঃসহায়, আত্মরক্ষা-অক্ষম যে প্রাণী
নিষ্ঠুর পুণ্যের আশা সে-জীবেরে হানি',
তারে তুমি প্রাণমূল্য দিয়ে আপনার
ধর্ম্মলোভী হাত হতে করিবে উদ্ধার —
তোমারে জানাই নমস্কার।

শুধু কালীঘাট নয়, 'বোলপুরের কাছে কঙ্কালীতলা বলে এক তীর্থে বৎসরে বিশেষ পরবে নানা ভক্তের মানৎ রূপে বহু শত পাঁঠার বলিদান হয়, নিকটের জলাশয় রক্তে লাল হয়ে ওঠে।' তাকেও তীব্র ভাষায় ধিক্কার দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এর পরেও বীরভূমের লোক তাঁকে সহ্য করবে?

আর শুধু কি পাঁঠা? তুচ্ছ মোষবলিতেও ঘোর আপত্তি ছিল বাঙালিদের এই 'জাতীয় কবি'র।

হেমন্তবালা দেবীকে লিখেছিলেন তিনিঃ 'মহাভারতের বকাসুর রোজ একটা করে মানুষ খেত — ভারতের পূজামন্দিরে দেবীও মহামাংস-নৈবেদ্যকে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য বলে গ্রহণ করেছেন তার প্রমাণ আছে উক্ত অসুরের লোভের সঙ্গে এই লোভের প্রভেদ কী? পাঁঠার রক্তলোভও সেই জাতেরই। পুরাণকাহিনীতে আছে চণ্ডী কোনো এক যুগে মহিষ নামধারী দানবকে বধ করেছিলেন — দানব যদি দুষ্ট স্বভাবের হয় দেবী ভালোই করেছিলেন। কিন্তু হতভাগা মহিষ পশুটা কী দোষ করেছে? কিন্তু মহিষের রক্তে দেবী প্রসন্ন হন এই কল্পনা করে যারা পূজা করে তাদের পূজা কি পূজা, না দেবতার অবমাননা?' (১৯৩৪)

এহেন ঠাকুরমশাইকে কালী-বিপণনের লাইনে আনতে না-পেরে পূজা-বিপণন-বিশেষজ্ঞরা খুবই চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের 'থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক' উঠে পড়ে লাগল, কোথাও টেগোর-সঙ স-এর মধ্যে কালীবন্দনা আবিষ্কার করা যায় কিনা। বাল্মিকী প্রতিভায় 'রাঙা পদপদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা' বলে গম্ভীর বাগেশ্রীতে একটি গান অবশ্য আছে রত্নাকরের মুখে। কিন্তু ভবদারা-টারা, তায় আবার বাগেশ্রী সুরে, এ বাজারে চলবে না। তখন গুগ্‌লে গিয়ে তাঁরা কালী বলে সার্চ করলেন। অমনি এসে গেল। 'ইউরেকা! মার দিয়া কেল্লা!' বলে লাফিয়ে উঠলেন পূজা-বিপণন টিমের হেড। 'নাচ্ শ্যামা, তালে তালে' বলে একটি দুর্দান্ত গান আছে ঠাকুরদার। এবার প্রশ্ন, কাকে দিয়ে গাওয়ানো যায়?

আবার গুগ্‌ল সার্চ। একই সঙ্গে রবীন্দ্রভক্ত, কালীভক্ত, চণ্ডীভক্ত, তাবৎ হিন্দু দেবদেবীভক্ত সম্ভ্রান্ত গায়িকা (গায়ক হলে চলবে না) কে আছেন? জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠল স্বাগতালক্ষী দাশগুপ্তের নাম। 'ইম্পেকেব্‌ল' তাঁর 'বায়ো-ডেটা।' খুব সুরেলা, ছাড়া গলা। রবীন্দ্রসঙ্গীতের শুধু জনপ্রিয় গায়িকা নন তিনি, শিক্ষিকাও। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব,

চমৎকার গুছিয়ে বাংলা বলেন। স্বয়ং পিয়ানো বাজিয়ে গান করেন। ইংরেজি গানেও বেশ দুরস্ত। টিভিতে অত্যন্ত জনপ্রিয় মুখ। একদিকে পুরো গীতবিতানের সব গান একা গাইবার অনন্য রেকর্ড তাঁর দখলে, অন্যদিকে কপালে চণ্ডীপুজোর রক্তচন্দনের ফোঁটা লেপে চণ্ডীপাঠ করেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ স্বাগতালক্ষী একটি টিভি চ্যানেলে গাইলেন 'নাচ্ শ্যামা, তালে তালে।' গাইবার আগে বললেন, তিনি ওটি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির সামনে বসে গেয়ে থাকেন এবং সমাগত কালীভক্তরা ভক্তিভরে সে-গান শোনেন।

দুই

এবার একটু ইতিহাসে আসি। খুব জনপ্রিয় না হলেও একেবারে অপরিচিত নয় গানটি। দেবব্রত বিশ্বাস এবং কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় আলাদা আলাদাভাবে গানটি রেকর্ড করেছেন। গানের কথাগুলি একবার শুনে নেওয়া যাক।

নাচ্ শ্যামা, তালে তালে।।
রুনু রুনু ঝুনু বাজিছে নুপূর, মৃদু মৃদু মধু উঠে গীতসুর,
বলয়ে বলয়ে বাজে ঝিনি ঝিনি, তালে তালে উঠে করতালিধ্বনি—
নাচ্ শ্যামা, নাচ্ তবে।।
নিরালয় তোর বনের মাঝে সেথা কি এমন নূপুর বাজে।
এমন মধুর গান? এমন মধুর তান?
কমলকরের করতালি হেন দেখিতে পেতিস কবে? —
নাচ্ শ্যামা, নাচ্ তবে।

ইতিহাস বলছে, উনিশ বছর বয়সে (১৮৮০) বিলেত থেকে ফেরার সময় জাহাজে বসে গানটি রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সর্গে নলিনী সখী অলকাকে বলছেঃ 'ওই দেখ, সখি, দাঁড়ের উপরে/মাথাটি গুঁজিয়া পাখার ভিতরে/শ্যামাটি আমার — সাধের শ্যামাটি/কেমন ঘুমায়ে আছে।' তার বালিকাসুলভ প্রস্তাব, ওর ঘুম ভাঙিয়ে, 'গান গেয়ে, তালি দিয়ে দিয়ে' নাচালে কেমন হয়? এর পরেই আছে 'শ্যামার প্রতি গান' — নাচ্ শ্যামা, তালে তালে। অর্থাৎ এ-শ্যামা, শ্যামা পাখি। এ যদি শ্যামাসঙ্গীত হয়, তবে সেটিকে বলা উচিত শ্যামাপক্ষীসঙ্গীত। মা কালী এর ধারেকাছেও নেই।

কিন্তু ভক্তির অসাধ্য কিছুই নয়। তাই কালীভক্ত বাঙালি

রবীন্দ্রসঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ স্বাগতালক্ষী একটি টিভি চ্যানেলে গাইলেন 'নাচ্ শ্যামা, তালে তালে।' গাইবার আগে বললেন, তিনি ওটি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির সামনে বসে গেয়ে থাকেন এবং সমাগত কালীভক্তরা ভক্তিভরে সে-গান শোনেন।

গায়িকা গানটিকে শ্যামাসঙ্গীতে পরিণত করবার অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করে বাঙালি সংস্কৃতির মুখ উজ্জ্বল করেছেন। যদি তিনি ইতিমধ্যেই বঙ্গবিভূষণ না-পেয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর নাম আমরা ওই উপাধির জন্য সুপারিশ করছি।

আর যতদিন সেটা না-পাচ্ছেন, ততদিন অন্তত বিপণনী কাণ্ডজ্ঞানের জন্য জনগণের পক্ষ থেকে তাঁকে মিউজিক-মার্কেটিং-রত্ন নামে নতুন একটি পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব রাখছি আমরা।

উমা

প্রসঙ্গত, শক্তিসাধকেরা নৃত্যরতা শ্যামাকে বড়ই পছন্দ করেন। বহু পদকর্তাই তাঁদের মাকে নাচিয়ে ছেড়েছেন। 'নেচে নেচে আয় মা শ্যামা' থেকে শুরু করে 'শ্মশানবাসিনী শ্যামা, নাচবি বলে নিরবধি', 'চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা', বা 'তুমি আপন সুখে আপনি নাচ, আপনি দেও মা করতালি। সদানন্দময়ী কালী' ইত্যাদি গানই তার প্রমাণ। রবি ঠাকুরের 'নাচ্ শ্যামা, তালে তালে' গানটি শুনে সম্ভবত শ্যামাভক্তেরা নিজেদের আর ধরে রাখতে পারেন নি! — **সঃ**

জ্যোতিষের বিরুদ্ধে লড়াই না চালালে মানুষ আরও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

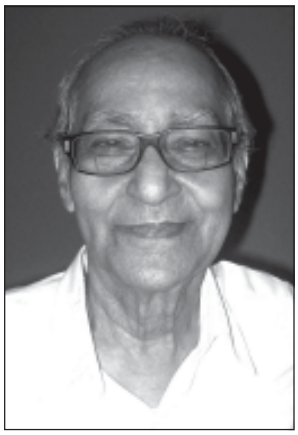

উৎস মানুষ পত্রিকার যাঁরা ব্যবস্থাপক, তাঁরা আজকে আমাকে এখানে ডেকেছেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য, তাঁদের কাছে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। অশোকের সঙ্গে আমার কীরকম সম্পর্ক ছিল সেটা প্রথমে বলি। অশোক একেবারে আমার ছোট ভাইয়ের মতো। একদিন আমাকে বলে, অমলেন্দুদা একটা ভাল লেখা দিতে হবে। আমি আমার কর্মব্যস্ততার মধ্যেও লেখা দিলাম, সেটা ছাপাও হল। ২০০১ সালে ইউজিসি একটা অসম্ভব বাজে কাজ করে ফেলল। ইউজিসি সারা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নির্দেশ দিল, আপনারা একটা বৈদিক জ্যোতিষ (Vedic Astrology) বিভাগ খুলুন, সেখানে জ্যোতিষশাস্ত্র পড়ানো হবে, আমরা অনেক টাকা দেব। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় রাজি হয় নি। সারা ভারতের দুটি কি তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় রাজি হল। সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ৩০ লক্ষ টাকা করে পেল। আমাদের মতো কিছু মানুষ, যাদের রক্ত স্ফুরিত হল। ইউনিভার্সিটিতে অ্যাস্ট্রোলজি ডিপার্টমেন্ট? তারই প্রতিবাদস্বরূপ আমি একটা বই লিখে ফেললাম— 'জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান?' ২০০১ সালের বইমেলার আর মাত্র ২২ দিন বাকি। আমি সল্টলেকে অশোকের বাড়ি গেলাম। বললাম, অশোক, অত্যন্ত পরিশ্রম করে, রাত জেগে এই বইটি আমি লিখেছি। ইউজিসি-র পরিকল্পনার প্রতিবাদ। তুমি কি বইমেলার আগে এই বইটি ছাপাতে পারবে? অশোক বলল, অমলেন্দুদা যেভাবেই হোক আমি বইটি ছাপাব। আমায় যদি প্রেসে বসে থাকতে হয়, না খেয়ে না দেয়ে হলেও এই বইটি ছাপব। অশোক সে অসাধ্য সাধন করল। বইমেলার ঠিক দু দিন আগে উৎস মানুষ-এর প্রকাশনায় 'জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান?' বইটি প্রকাশ হল। বইমেলায় একটা সুন্দর সভা করে সেটার উদ্বোধন হল। বইমেলায় বেশ ভাল বিক্রিও হল। এই বই প্রকাশের জন্য অশোকের কাছে আমার ঋণ এবং কৃতজ্ঞতার কোনও সীমা নেই। আমি আজও অশোকের কাছে আমার ঋণ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। উৎস মানুষ এই বইয়ের প্রথম তিনটি প্রকাশনা বার করতে পেরেছিল। তারপর আর্থিক সঙ্কটের জন্য আর পারেনি। তখন অশোক আমাকে বলল, অমলেন্দুদা আমাদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যদি বইটি অন্য কোনো প্রকাশকের কাছ থেকে বার করার চেষ্টা করেন তো ভাল হয়। আমি তখন দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানির অরবিন্দ দাশগুপ্তকে বললাম, অরবিন্দ এই বইটা ছাপতে পারবে? অরবিন্দ বলল, এক কথায় ছাপব। চতুর্থ সংস্করণ থেকে আজকে ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশ হয়েছে দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি থেকে।

এই হচ্ছে অশোকের অসাধারণ নিষ্ঠা আর বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের জন্য আন্তরিক চেষ্টা। আমি অনেকদিন থেকে

বাংলা পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করি। বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাকে লিখতেই হয়। বাংলায় উৎস মানুষ যে ধরনের প্রকাশনা এমন একটিও পত্রিকা আর নেই। অশোক ছিল নির্ভীক, এমন নির্ভীক সম্পাদক আমি আর দেখি নি। কাউকেও ভয় পেত না। অশোকের কোনও তুলনা হয় না। আজকে যাঁরা এই পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁদের প্রত্যেককে আমি অন্তর থেকে প্রশংসা না করে পারছি না। অশোকের এই প্রচেষ্টাকে তাঁরা বাঁচিয়ে রেখেছেন। আজও তাঁরা 'অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা'র এমন সুন্দর আয়োজন প্রতি বছর করেন।

আমার এবারের বক্তৃতার বিষয় 'অ্যাস্ট্রোনমি ভার্সাস অ্যাস্ট্রোলজি' অর্থাৎ 'জ্যোতির্বিজ্ঞান বনাম জ্যোতিষশাস্ত্র'। আশা করি, আপনারা খোলামনে এটা শুনবেন। বিচার-বিবেচনা করবেন।

জ্যোতিষচর্চা সর্বপ্রথম এই পৃথিবীতে শুরু হয়েছিল বর্তমানে সুমের বা ব্যাবিলনে, বর্তমানে ইরাক যে দেশের নাম তার আগের নাম ছিল এইগুলো। ব্যাবিলনের পুরোহিতরা ৫০০০ বছর আগে শুরু করেছিলেন এই জ্যোতিষচর্চা। ইরাক তো মরুভূমির দেশ। তাই সারা বছর পরিষ্কার আকাশ থাকত, তারাগুলোও সুন্দর দেখা যেত। তখনকার কি মুসলমান বাদশা কি হিন্দু রাজা, তাঁদের রাজদরবারে রাজজ্যোতিষী রাখা হত। রাজজ্যোতিষীরা উপদেশ দিতেন, কখন কী করতে হবে। এরই ফলে রাজজ্যোতিষীরা অত্যন্ত সম্মান পেয়ে গেলেন।

আগে আমরা জেনে নেব, জোডিয়াক কাকে বলে। জোডিয়াক হচ্ছে রাশিচক্র। সূর্য আকাশ পরিক্রমা করছে পূব থেকে পশ্চিমে। কিন্তু সূর্য তো কেন্দ্রে স্থির, তাই সূর্য চলবে কেমন করে? আসলে পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে পরিক্রমা করে চলেছে, পশ্চিম থেকে পূবে, আর তারই দরুণ আমাদের কাছে মনে হয় যেন সূর্য আকাশে চলে বেড়াচ্ছে। এটা হল আপাত গতিবেগ, একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। চলন্ত ট্রেনে আমরা জানলা দিয়ে দেখি উল্টোদিকে বাড়িঘর, গাছপালা ছুটছে, কিন্তু আসলে তো তা নয়। আমরা যে সূর্যের আপাত চলাটাকে দেখি আকাশে সেটাও ঠিক এমনি, সত্যি সত্যি পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে পরিক্রমা করছে। সূর্যের এই যে পথটা তাকে বলা হয় ক্রান্তি-বৃত্ত। ক্রান্তি-বৃত্তের ৯ ডিগ্রি তলায় ও ৯ ডিগ্রি ওপরে ১৮ ডিগ্রির একটা চওড়া কোমরবন্ধনী বা বেল্ট ব্যাবিলনের জ্যোতির্বিদরা আকাশে কল্পনা করেছিলেন। এই চওড়া বেল্টের সারা আকাশে যে বেষ্টনী, তার পরিমাপ ৩৬০ ডিগ্রি। এটাকে ওঁরা ১২টা ভাগে ভাগ করলেন এরই এক একটা ভাগ ফল হল ৩০ ডিগ্রি। এই এক এক ভাগকে বলা হয় এক এক রাশি। প্রথমে মেষ, তারপরে বৃষ, এইভাবে ১২টা রাশি। সূর্য এক একটা রাশিতে এক মাস থাকে। জ্যোতিষচর্চায় এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য।

জ্যোতিষের মূল জিনিসটা হল যখন কোনো শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, ঠিক সেই সময়ে গুটিকয়েক গ্রহ আকাশে কোন কোন রাশিতে অবস্থান করছে তা জানা। সেটা জ্যোতিষীরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে জেনে নেন। আর এই অবস্থান ভিত্তি করে জ্যোতিষীরা একটা জন্মছক তৈরি করেন, আর ওঁদের ধারণা এই জন্মছক বিশ্লেষণ করে জাতকের সবকিছু, মানে এ থেকে জেড, বলে দিতে পারেন. এটা ওঁদের দাবি। সেই জাতক কতদিন বাঁচবে, তাঁর বিবাহ কবে হবে ইত্যাদি। জন্মছকে ১২টা রাশি। Ascendant হচ্ছে লগ্ন। জ্যোতিষীদের কাছে লগ্ন অত্যন্ত জরুরি তথ্য। লগ্ন কাকে বলে? শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হল, ঠিক সেই মুহূর্তে পূর্বদিকে যে রাশিটি উঠছে, সেই রাশি হল লগ্ন রাশি। জ্যোতিষচর্চা শুরু হয়েছিল সারা পৃথিবীতে ব্যাবিলনে। সেখান থেকে মিশর, ভারতবর্ষ, চীন দেশে যায়। যে সময় জ্যোতিষচর্চা শুরু হয়েছিল সেই সময়ে সারা পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল 'জিওসেন্ট্রিক ইউনিভার্স' অর্থাৎ ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব। জিওসেন্ট্রিক ইউনিভার্সের একেবারে কেন্দ্রে আছে পৃথিবী, তারপরে চাঁদ পরিক্রমা করছে, তারপর বুধ, তারপর সূর্য এই করে শনি পর্যন্ত গ্রহ। কিন্তু শনি পর্যন্ত গ্রহ কেন, তার কারণ তখনও টেলিস্কোপ আবিষ্কার হয়নি, তাই রাতের আকাশে শনি পর্যন্ত গ্রহ খালি চোখে দেখা যেত। চন্দ্র সূর্য দুটো গ্রহ (তাঁরা ধরেছিলেন) আর শনি পর্যন্ত আরও ৫টা গ্রহ। তাহলে মোট গ্রহের সংখ্যা দাঁড়াল সাত। তাঁরা আরও দুটো দানব গ্রহের কল্পনা করেছিলেন— রাহু ও কেতু। এই হল নব গ্রহের কল্পনা জ্যোতিষীদের। ভূকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব— এটা কিন্তু বুঝতে হবে এই পটভূমিকায় রচিত সারা পৃথিবীর জ্যোতিষশাস্ত্র। এর জোরদার প্রবক্তা ছিলেন গ্রিস দেশের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ টলেমি। তিনি অনেকদিন রাজত্ব করে গেছেন, সারা ইউরোপ তখন এঁর কথা মেনে চলত, তাহলে এটা সুনিশ্চিত যে ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের ওপরেই জ্যোতিষশাস্ত্র রচিত হয়েছিল।

এরপরে এলেন কোপার্নিকাস। তিনি ইউরোপের পোল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১১ বছর আকাশ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। পর্যবেক্ষণ করলেন আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্ক, সূর্য, চন্দ্র তাদের অবস্থান। তিনি এই তত্ত্বে উপনীত হলেন,

গিয়ে বিচারালয়ে বললেন, মহামান্য ধর্মাবতার, আমি আপনার কেন্দ্রে পৃথিবী নয়, কেন্দ্রে আছে সূর্য, আর সূর্যের চারদিকে পরিক্রমা করছে পৃথিবী সমেত সব গ্রহগুলো। চন্দ্র পৃথিবীর একটা উপগ্রহ। চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে পরিক্রমা করছে। এই সূত্র ধরে কোপার্নিকাস একটা বই লিখলেন Helocentric Universe, কিন্তু সেটা ছাপাতে পারলেন না। তার কারণ, ওটা যদি উনি ছাপান তাহলে রোমের পোপ ওঁকে ধরে নিয়ে যাবেন এবং প্রাণদণ্ড দেবেন। বাইবেলে আছে জিওসেন্ট্রিক ইউনিভার্স, সেইজন্য বইটাকে ছাপতে পারলেন না, সেটা বুকের পাঁজর করে রাখলেন। ১৫৪৩ সাল— কোপার্নিকাস তখন মৃত্যুশয্যায়। ওঁর বন্ধু বললেন, কোপার্নিকাস তোমার পাণ্ডুলিপিটা আমাকে দাও, আমি ওটা ছাপাব। কোপারনিকাস বন্ধুকে বিশ্বাস করে পাণ্ডুলিপিটা দিলেন। তখন তাঁর মৃত্যুর আর মাত্র ৯ দিন বাকি আছে। যখন বইটা ছাপা হয়ে এল, তখন তাঁর মৃত্যুর মাত্র ৯ ঘণ্টা বাকি। উনি দেখলেন, তাঁর বইটা ছাপা হয়েছে এবং খুব খুশি হলেন এবং পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু কোপার্নিকাস যে সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব প্রকাশ করে গেলেন, সেটি অনুমোদিত হল না। তার কারণ বাইবেলে আছে জিওসেন্ট্রিক ইউনিভার্স, কেউ যদি সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব-র কথা বলে, তাহলে সর্বেসর্বা পোপ তার মৃত্যুদণ্ড দেবেন। সুতরাং কেউ সাহস করে সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের নাম উচ্চারণও করতে পারলেন না।

ছিলেন একজন দুঃসাহসী, তাঁর নাম জিওর্দানো ব্রুনো, ইনি ইতালির লোক। তিনি সারা ইউরোপে বলতে লাগলেন, বাইবেলে যে জিওসেন্ট্রিক ইউনিভার্সের কথা আছে, তা ভুল, কোপার্নিকাসের হেলিওসেন্ট্রিক ইউনিভার্সের তত্ত্বই ঠিক। আর একটা কথা সাঙ্ঘাতিক বলে ফেললেন। আপনারা ধর্মোপদেশের জন্য বাইবেলের দ্বারস্থ হবেন, জ্যোতির্বিজ্ঞান শেখার জন্য বাইবেলের দ্বারস্থ কোনও দিন হবেন না। এতবড় কথা! পোপ ওঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে গেলেন রোমে। বিচার শুরু হল। বিচারে ব্রুনো দোষী সাব্যস্ত হলেন, তাঁকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হল। সেই প্রাণদণ্ড কি সাঙ্ঘাতিক! দিনের বেলা ১১টার সময় ৩০ হাজার লোকের সামনে ওঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হল। মানব সভ্যতার এত বড় কলঙ্ক পৃথিবীতে বোধহয় আর নেই।

এবারে আমরা দেখব, বিজ্ঞান কীরকম প্রগতিশীল। কোপার্নিকাস বললেন, গ্রহগুলো সূর্যের চারদিকে পরিক্রমা করছে বৃত্তাকার পথে। এক জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেপলার মঙ্গল পর্যবেক্ষণ করে বললেন, না, গ্রহগুলো সূর্যের চারদিকে বৃত্তাকার পথে পরিক্রমা করছে না, পরিক্রমা করছে উপবৃত্তাকার পথে। একটা ডিমের মতো, তার দুটো ফোকাস, একটা ফোকাসে সূর্য। বিজ্ঞান কীরকম প্রগতিশীল? কোপার্নিকাস ১১ বছর পর্যবেক্ষণ করে যে আবিষ্কার করলেন, তার ভুল ধরলেন কেপলার। আজকে আমরা স্থির জেনেছি যে, সত্যি সত্যি সূর্যের চারপাশে গ্রহগুলো পরিক্রমা করছে উপবৃত্তাকার পথে।

এখন বলি, রাহু আর কেতুর ধারণাটা কী করে এসেছিল। দিনের বেলা যখন সূর্য সম্পূর্ণরূপে কালো হয়ে যায় জ্যোতিষীরা বললেন এক দানব গ্রহ আছে রাহু, সে এসে সূর্যকে খেয়ে ফেলেছে, তাই সূর্য কালো হয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সূর্য বেরিয়ে আসে, ওঁরা বললেন ওই দানব গ্রহের গলাটা কাটা, তাই বেশিক্ষণ সূর্যকে গিলে রাখতে পারে না। এরপর কেতু, যখন পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ হয়। তখন ওঁরা বললেন যে আরেকটা দানব গ্রহ আছে কেতু, সে এসে চাঁদকে গিলে খেয়েছে, ওরা বললেন, কেতুরও গলা কাটা। তাহলে রাহু আর কেতু ওদের দুটো কাল্পনিক গ্রহ। এই হচ্ছে জ্যোতিষের বিজ্ঞান।

ভূকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বকে একেবারে হটিয়ে দিয়ে যিনি সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন তিনি গ্যালিলিও। ১৬০৯ সালে তাঁর নিজের তৈরি টেলিস্কোপের মাধ্যমে আকাশের জ্যোতিষ্ককে পর্যবেক্ষণ করলেন। তিনি চাঁদ, বৃহস্পতি, শুক্রকে পর্যবেক্ষণ করলেন এবং সমস্ত পর্যবেক্ষণ করার পরে কোপার্নিকাসকে সমর্থন করে একটা বই লিখে ফেললেন। ঝড় উঠে গেল। তখন গ্যালিলিওর বয়স ৭০ বছর। গ্যালিলিও কোপার্নিকাসকে সমর্থন করছেন, বাইবেলের বিরুদ্ধে! ৭০ বছর বয়স্ক গ্যালিলিওকে ফ্লোরেন্স থেকে ধরে আনা হল, তাঁর বিচার শুরু হল। বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন, তাঁর প্রাণদণ্ড স্থির করলেন পোপ। পরদিন সকাল ৮টায় তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেবেন পোপ। আগের দিন শেষ রাতে ৪টের সময় কারাগারে গিয়ে পোপের দরবারের একজন বড় মাপের যাজক গ্যালিলিওকে বললেন, গ্যালিলিও কালকে তোমার প্রাণদণ্ড, পোপ সকাল ৮টার সময় ঘোষণা করবেন। আমার একটা অনুরোধ আছে। ওঁর ঘোষণার আগে তুমি পোপের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করো, তুমি বলো, আমি এতদিন যা বলেছি, তা মিথ্যা, ভুল। তাহলে পোপ তোমায় ক্ষমা করবেন, হয়ত প্রাণদণ্ড দেবেন না, গৃহবন্দী করে রাখবেন। তাহলে তুমি তোমার গবেষণা চালিয়ে যেতে পারবে, সারা পৃথিবীর লোক তাতে উপকৃত হবে তোমার গবেষণায়। গ্যালিলিওর কথাটা খুব ভাল লাগল। পরদিন পোপের কাছে

কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি, আমি এতদিন যা বলেছি তা ভুল, মিথ্যা, সে সব আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি, আপনি আমায় ক্ষমা করে দিন। পোপ ক্ষমা করলেন, তাঁকে ফ্লোরেন্সের একটা বাড়িতে গৃহবন্দী করে রেখেছিলেন। এই গৃহবন্দী অবস্থায় গ্যালিলিও প্রায় ৯ বছর বেঁচেছিলেন, আর এই অবস্থায় তিনি Statics, Dynamics, Hydrostatics বিষয়ে নতুন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। সারা পৃথিবীর মানুষ তাতে উপকৃত হয়েছেন।

এখন বলি সত্যি সত্যি রাহু আর কেতু কী। সূর্য কেন্দ্রে আর পৃথিবী তার চারপাশে পরিক্রমা করছে। আর চাঁদ পরিক্রমা করছে পৃথিবীর চার পাশে, চাঁদের এই পরিক্রমাটা পৃথিবীর পরিক্রমা পথের একবার নীচে একবার ওপরে। যখন চাঁদ ওপরের দিকে ওঠে তখন পৃথিবীর পরিক্রমা পথ আর চাঁদের পরিক্রমা পথের যে ছেদবিন্দু তাকে বলে ascending mode —রাহু, যখন নীচের দিকে নামে তখন যে ছেদবিন্দু তৈরি হয় তাকে বলে descending mode অর্থাৎ কেতু। তাহলে রাহু আর কেতু হল মহাকাশে দুটো পরিক্রমা পথের ছেদবিন্দু, তারা কোনো গ্রহ নয়, দানবগ্রহও নয়! জ্যোতিষীরা একে সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার আখ্যা দিয়ে বলছেন, রাহু আর কেতু দুটো দানবগ্রহ। এখনও জ্যোতিষীরা জন্মছক তৈরি করছেন সূর্য আর চন্দ্রকে দুটো গ্রহ হিসেবে গণ্য করে। একটা বাচ্চা ছেলেও জানে, সূর্য একটি নক্ষত্র, আর চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ। জ্যোতিষীরা কিন্তু সূর্য আর চন্দ্রকে দুটো গ্রহ হিসেবে এখনও গণ্য করে চলেছেন। কি সাঙ্ঘাতিক মিথ্যাচার! রাহু আর কেতুকে আজও দুটো জ্যোতিষ্ক হিসাবে কেন গণ্য করা হচ্ছে? তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। আরও বড় টেলিস্কোপ আবিষ্কার হওয়ার পরে সৌরজগতে ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো আবিষ্কৃত হয়েছে। জ্যোতিষীরা কিন্তু ইউরেনাস নেপচুন প্লুটোকে ধর্তব্যের মধ্যে আনছেন না কেন? জ্যোতিষীরা এর কোনও সদুত্তর দিতে পারছেন না।

জ্যোতিষীদের আজগুবি ধারণা Venus বা শুক্র গ্রহ নিয়ে— জন্মছকে যদি কোনও পুরুষ মানুষের শুক্র গ্রহের অবস্থান বিশেষ ভালো থাকে, জ্যোতিষীরা বলেন, আপনার ছকে তো শুক্রগ্রহের অবস্থান বেশ ভাল, অনেক মেয়ে আপনার প্রেমে পড়বে। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে বলেন, অনেক পুরুষ আপনার প্রেমে পড়বে। রোমানরা রাতের আকাশে এই গ্রহটি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। Venus হচ্ছে রোমানদের সৌন্দর্য আর প্রেমের দেবী, তাই তাঁরা নাম রেখেছিলেন Venus। ১৯৮২ সালে পূর্বতন সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা একেবারে শুক্রের কাছে একটি মহাকাশযান পাঠিয়েছিলেন । সেটা গিয়ে স্পেক্ট্রোস্কোপ দিয়ে দেখেছে যে, এর চারদিকে যে ঘন গ্যাসের বায়ুমণ্ডল তা হচ্ছে বিষাক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। সূর্যের আলো গেলে এত সুন্দর প্রতিফলন হয়, তাই এই গ্রহকে রাতের আকাশে এত উজ্জ্বল দেখায়। একটা অবতরণ যান শুক্রের মাটিতে নেমে শুক্রের মাটির তাপমাত্রাও পরীক্ষা করে দেখেছে যে, তা ৪৮০° সেলসিয়াস। তাই মহাকাশযুগ আসার পর আমরা জেনেছি যে, শুক্রগ্রহ প্রেমের জায়গা নয়, একেবারে মৃত্যুর জায়গা।

এবারে বলব মঙ্গলকে নিয়ে। জ্যোতিষীরা বলেন, মঙ্গল গ্রহ যদি কারোর জন্মছকে নীচস্থ থাকে তবে তার রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয়। প্রাচীন কালে রোমের মানুষ দেখলেন রাতের আকাশে লাল রঙের একটি গ্রহ। লাল রঙ মানেই প্রচুর রক্তক্ষরণ, প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় একটা যুদ্ধ ক্ষেত্রে। রোমানদের যুদ্ধের দেবতা, তার নাম Mars। তাই তারা ওই গ্রহের নাম রেখেছিলেন Mars। আজও ওই গ্রহ সেই নামেই পরিচিত। আমেরিকা ১৯৭৬ সালে দুটো মহাকাশযান পাঠিয়েছিল মঙ্গলের কাছে, তাদের নাম ছিল ভাইকিং ওয়ান ও ভাইকিং টু। এই মহাকাশযান দুটি থেকে দুটি অবতরণযান মঙ্গলের বুকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরা মঙ্গলের ওপর নেমে কিছু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, তার থেকে জানতে পারা যায় যে, মঙ্গলের মাটিতে আছে প্রচুর পরিমাণে ফেরিক অক্সাইড। আর ফেরিক অক্সাইড-এর ধর্ম হল এতে সূর্যের আলো পড়লেই দারুণ লাল রঙ হয়। এটা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে ওখানে অবতরণযান নামিয়ে। এর মধ্যে কোনও বুজরুকি নেই। তাই জ্যোতিষীদের চরম বুজরুকি ধরা পড়েছে মহাকাশযুগ আসার পরে।

এবারে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। 'বন্দে মাতরম' মন্ত্রের জনক। তিনি খুব জ্যোতিষচর্চা করতেন। তিনি বড় মেয়ের বিয়ে দেবেন। মেয়ে ও হবু জামাইয়ের জন্মছক নিয়ে ভাটপাড়ার এক বিখ্যাত জ্যোতিষীর কাছে গেলেন যোটক বিচারের জন্য। যোটক বিচার করে জ্যোতিষী বললেন, রাজযোটক হয়েছে, আপনি বিয়ে দিয়ে দিন, বিয়ে দিলেন। দেড় বছরের মাথায় মেয়ে বিধবা হয়ে বাবার কাছে ফিরে এল। এরপরেও তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে আস্থা হারান নি। বছর তিনেক পরে ছোট মেয়ের বিয়ের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার হল। তিনি কলকাতার এক রাজজ্যোতিষীর কাছে গেলেন যোটক বিচারের জন্য। রাজজ্যোতিষী বিচার করে

বললেন, অসম্ভব সুন্দর রাজযোটক। আপনি নিশ্চিন্তে বিয়ে দিন, বিয়ে দিলেন। কিন্তু সাড়ে সাত মাসের মধ্যে ছোট মেয়েও বিধবা হয়ে বাবার কাছে ফিরে এল। বঙ্কিমচন্দ্রের অবসর নেবার আর মাত্র ১ বছর ৩ মাস বাকি ছিল, তিনি বহু জ্যোতিষের বই সংগ্রহ করেছিলেন এই ভেবে যে, অবসরের পরে জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করবেন। কিন্তু দুই মেয়ের বৈধব্যে তিনি অসম্ভব বিরক্ত হলেন। তিনি ভৃত্যকে আদেশ দিলেন, জ্যোতিষশাস্ত্রের বইগুলো উঠোনে নিয়ে এসে তাতে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিতে, আর ভ্রাতুষ্পুত্রকে চিঠি দিলেন, কখনও জ্যোতিষশাস্ত্রে আস্থা রাখিও না।

আমাদের স্মৃতিপটে এখনও আছে, হিরোসিমা-নাগাসাকির বোমা বিস্ফোরণে আড়াই লাখেরও বেশি লোক মারা গিয়েছিলেন নিমেষে। এই আড়াই লাখ লোকের কি একই সময়ে মৃত্যুযোগ ছিল? জ্যোতিষশাস্ত্র কী বলে? এখানেও জ্যোতিষীরা সম্পূর্ণ নিরুত্তর। বেশ কিছু বছর আগে মেক্সিকোতে ভূমিকম্পে ৪২ হাজার লোক মুহূর্তের মধ্যে মারা গেল, ৪২ হাজার লোকের ছকে কি একই সঙ্গে মৃত্যুযোগ ছিল? কিছু বছর আগে গুজরাটের ভূজ অঞ্চলে ভূমিকম্পে নিমেষের মধ্যে প্রচুর মানুষ মারা গিয়েছিল। জ্যোতিষশাস্ত্র এখানে মুখ থুবড়ে পড়ে, তাদের কাছে এর কোনও উত্তর নেই।

আমি আরও একটা দৃষ্টান্ত এখানে আনতে চাই। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইডেনে মেয়েরা আসেন প্রসবের জন্য, সেখানে পাশাপাশি ছটা বেড। একদিন একই সময়ে একই সঙ্গে ২টো প্রসব হল। একজনের বাবা অধ্যাপক, অত্যন্ত অবস্থাপন্ন পরিবার। আরেকজনের বাবা বস্তিতে থাকে, দাগি আসামী, ৩-৪ বার জেল খেটেছে, দুর্ধর্ষ অপরাধী। এই দুটি ছেলের জন্মছক কিন্তু একেবারে এক হয়ে গেল। কিন্তু এই দুটি ছেলের জীবনলিপি কি এক হতে পারে? জ্যোতিষশাস্ত্র এখানে একেবারে নিরুত্তর। জ্যোতিষীরা এখানে একেবারে নির্বাক।

সোভিয়েট রাশিয়ার একেবারে উত্তর মেরুর কাছে একটি শহর আছে, তার নাম মুর্মানস্ক্। ওখানে সাড়ে ৩ থেকে ৪ লাখ লোকের বাস। একেবারে উত্তর মেরুর কাছে বলে এখানে ৬ মাস দিন আবার ৬ মাস রাত্রি। এই ৬ মাস রাত্রি যখন থাকে তখন ওই শহরের আকাশে সূর্য দেখা যায় না, তাই সেখানে রাশিচক্র নেই। তাই রাতের ৬ মাসে যাঁরা জন্মগ্রহণ করবেন তাঁদের জন্মছক হবে না। তবুও তাঁদের মধ্যে অনেক উঁচুদরের বিজ্ঞানী বা সাহিত্যিক হবেন, আবার কেউ দুর্ধর্ষ অপরাধীও হবে। জন্মছক হচ্ছে না, কিন্তু তাঁদের জীবন ঠিক চলছে। এটা গবেষণা করে বার করেছেন একজন খ্যাতনামা ফরাসি অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট জাঁ ক্লদে পেকার (Jean-Claude Pecker), তিনি জ্যোতিষীদের গালে থাপ্পড় মারার জন্যে অনেক গবেষণা করে এটা বার করেছেন।

এবারে ভারতের ইদানীংকালের সবচেয়ে খ্যাতনামা জ্যোতিষীর ভাগ্য গণনার নমুনার একটা দৃষ্টান্ত দিই। ভারতে জ্যোতিষীকুলের চূড়ামণি বলে খ্যাত হলেন, ব্যাঙ্গালোরের ডঃ বি ভি রমন। ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রের ওপর একটি মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, এর নাম হল The Astrological Magazine। বছর ২০০-৩০০-র মধ্যে এতবড় মাপের জ্যোতিষী নাকি ভারতে আর হয় নি! তাঁরই একটি ভবিষ্যদ্বাণীর নমুনা আপনাদের সামনে রাখব— জানুয়ারি ১৯৮০, লোকসভা নির্বাচন। কেন্দ্রে তখন জনতা পার্টি সরকার আর ইন্দিরা গান্ধী চেষ্টা করছিলেন এই লোকসভা নির্বাচনে জিতে কী করে আবার প্রধানমন্ত্রী হওয়া যায়। বি ভি রমন তাঁর সুবিখ্যাত ম্যাগাজিনের জুলাই ১৯৭৯ সংখ্যায় লিখলেন, 'জনতা সরকারের পতনের কোনো সম্ভাবনা নেই, তার কারণ হল এঁদের লগ্নে বৃহস্পতি।' কিন্তু আমরা সকলে জানি, ওই নির্বাচনে জনতা পার্টি হেরে ভূত হয়ে গিয়েছিল, আর ইন্দিরা গান্ধী জিতে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।

এবার আমার জীবনের একটা ছোট্ট ঘটনাতে আসি। ১৯৯১, ১৭ নভেম্বর রবিবার, কলকাতার খ্যাতনামা The Statesman পত্রিকায় আমার একটা লেখা প্রকাশিত হয়েছিল জ্যোতিষের বিরুদ্ধে। নিবন্ধের নাম 'Do Planets Rule Our Lives?' সেদিন রোববার সকাল ৭টা ২০, আমার স্ত্রীর কাছে একটা টেলিফোন এল। অমলেন্দুবাবু কি বাড়ি আছেন? আমার স্ত্রী উত্তর দিলেন, উনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার দিতে গেছেন। তখন টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে শোনা গেল, 'উনি আজকে স্টেটসম্যানে একটা লেখা লিখেছেন জ্যোতিষের বিরুদ্ধে, ১০ দিনের মধ্যে আপনার স্বামীর লাশ পড়ে যাবে, আপনি সুনিশ্চিতভাবে বিধবা হবেন।' এইভাবে ৩২ খানা উড়ো চিঠি এসেছে, উড়ো টেলিফোন আসতে লাগল— আমায় ওরা খুন করবে। আমি তখন এক বন্ধুর কাছে গেলাম, তার সাহায্যে লালবাজারে সিনিয়ার ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের কাছে গেলাম। আমি ওঁকে গিয়ে সব বললাম। উনি এর সমাধান করে দিলেন, আমাকে বললেন, আপনি বাড়ি যান, তিন দিন পরে আপনার বাড়িতে আর কোনও টেলিফোন বা

চিঠি যাবে না। সত্যি সত্যি তিন দিন পরে আমার বাড়িতে আর টেলিফোন বা উড়ো চিঠি এল না। শুনেছিলাম এটা করেছিল জুয়েলার্স আর জ্যোতিষীরা, আর এদের কড়া ধমক দিয়েছিলেন ওই পুলিশ অফিসার।

সারা বিশ্বে পরম শ্রদ্ধেয় গৌতম বুদ্ধ আড়াই হাজার বছরেরও ওপর আগে ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কী অসাধারণ র‍্যাশনালিটি গৌতম বুদ্ধের। শিষ্যদের বলেছেন, আমি তোমাদের বলে যাচ্ছি, কোনোদিন জ্যোতিষচর্চা করবে না। জ্যোতিষচর্চা অন্ধকারের পথ, ঐ পথে কখনও হাঁটবে না। আবার তিনি শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছেন— আমি তোমাদের গুরু, কিন্তু গুরু হয়ে যা বলছি তা তোমরা মেনে নিও না। তোমার শিক্ষক তোমার পরম গুরু, তোমার পিতা তোমার পরম গুরু, তাঁরা যা বলছেন বলেই তা মেনে নিও না। তুমি নিজে বিচার করে দেখবে যে, এইটা গ্রহণ করলে অনেক মানুষের মঙ্গল হবে কি? যদি সত্যি মঙ্গল হবে বলে মনে করো তবেই তা গ্রহণ করবে। গৌতম বুদ্ধের এই rationality বা মননশীলতার কোনো নজির সারা পৃথিবীতে নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ এক জায়গায় বলেছেন, আমরা অনেক মানুষকে দেখি অসুস্থ হয়ে কষ্ট পাচ্ছেন, বেশ কষ্ট পাচ্ছেন। অনেকসময় দেখতে পাওয়া যায়, তাঁরা তাঁদের জন্মছক নিয়ে জ্যোতিষীদের কাছে যাচ্ছেন দেখাতে যে, কবে তাঁদের ভাল সময় আসবে। তিনি এঁদের জন্য বলে গেছেন, জ্যোতিষচর্চা সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাঁদের উচিত তখন সুচিকিৎকের কাছে যাওয়া, ভাল চিকিৎসা করা, ভাল পথ্য খাওয়া, ভাল ওষুধ খাওয়া। এমন অসুস্থতার জন্য জ্যোতিষের কাছে কোনোদিন যেও না।

রবীন্দ্রনাথকে ১৯৩১ সালে নাটোরের মহারাজার পুত্রবধূ হেমন্তবালা দেবী চিঠি লেখেন, গুরুদেব আমাদের নাটোরের মহারাজার বাড়িতে এত জ্যোতিষচর্চা হয়, সে আপনাকে কি বলব। ১২ জন মানুষ খাবেন, কবে খাবেন জ্যোতিষী ডাকো— তারিখ এবং সময় দেখ। একজন ১০ মাইল দূরে যাবেন, জ্যোতিষী ডাকো, তিনি দেখে বলবেন কবে যাবেন, কখন যাবেন। আপনি কী বলেন, এগুলো কি ঠিক? তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তিনখানা সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ চিঠি লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, জ্যোতিষ একেবারে অবৈজ্ঞানিক, কোনওরকম বিজ্ঞানের ভিত্তি জ্যোতিষে নেই। তিনি কোনোদিন জ্যোতিষে বিশ্বাস করতেন না।

১৯৭৫ সালে ১৯ জন বিজ্ঞানের নোবেল লরিয়েট ঘোষণা করেছিলেন, আমরা নোবেল লরিয়েটরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে আকাশের গ্রহ, নক্ষত্র, জ্যোতিষ্ক এরা মানুষের জীবনকে কোনওরকম প্রভাবিত করতে পারে না। সারা পৃথিবীতে জ্যোতিষীরা ব্যবসা করে খাচ্ছেন এবং মানুষ ঠকাচ্ছেন, এদের শিকার আপনারা হবেন না। ১৯ জন নোবেল লরিয়েট, তার মধ্যে ছিলেন একজন ভারতীয়, সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর, প্রফেসর অভ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, শিকাগো ইউনিভার্সিটি, সি ভি রমনের ভাইপো। ১৯ জন নোবেল লরিয়েট এই ঘোষণাপত্রে সই করেছিলেন।

আমার শেষ বক্তব্য আলবার্ট আইনস্টাইন। ১৯৫৩ সালে West German Congress of Free Thinkers -এর কাছে একটি বার্তা তিনি পাঠিয়েছিলেন, কী অসাধারণ আইনস্টাইনের এই উক্তি! আমাদের এই পৃথিবীর সর্বদেশে আমাদের আশেপাশে অগণিত মানুষ ও নির্বোধ বোকা আর তাদের নির্বুদ্ধিতাকে অসৎ উপায়ে কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ঘটিয়ে চলেছেন কিছু ধুরন্ধর মানুষ। এদের বিরুদ্ধে লড়াই করা খুবই দুরূহ কাজ। তবু এ লড়াই চালানো অবশ্য কর্তব্য, কারণ তা না-হলে মানবজাতি আরও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়বে।

বিঃ দ্রঃ— অমলেন্দুবাবু স্মারক বক্তৃতায় যা বলেছিলেন এ লেখাটি তারই পরিমার্জিত লিখিত রূপ।— সম্পাদক

উমা

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা।

প্রাপ্তিস্থানঃ পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বইচিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিত ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া)। শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল। পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন **নম্বরঃ** ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০-১২৬৩৭।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা
জ্যোতিষ-বিরোধী মনোজ্ঞ আলোচনা

জ্যোতিষ যে বিজ্ঞান নয়, এর যে আদৌ কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, তা আমরা, যারা 'উৎস মানুষ'-এর সঙ্গে কমবেশি যুক্ত আছি, তারা সবাই জানি। আমাদের এই জানার ভিতটা যিনি গড়ে দিয়েছেন, তিনি বর্তমানে ৮৮ বছরের যুবক। হ্যাঁ, আমি সেই যুবকের কথাই বলছি, যিনি গত ১৮ নভেম্বর, ২০১৭ বিড়লা তারামণ্ডলের সভাগৃহে 'উৎস মানুষ' আয়োজিত 'অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতায়' মূল বক্তা ছিলেন। এই যুবকটি হলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় নবতিপর বয়সে পৌঁছেও তিনি জ্যোতিষ বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নিরলস লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। আর এই লড়াই চালাতে গিয়ে তাঁকে নানা রকম প্রতিবন্ধকতার মুখেও পড়তে হয়েছে। এমনকি বেশ কয়েকবার তাঁকে প্রাণে মারার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। তবু তিনি যে দমবার পাত্র নন, তাঁর কর্মধারাই বলে দিচ্ছে।

বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী রাজশ্রী ভট্টাচার্যের গাওয়া রবীন্দ্রনাথের দুটি শ্রুতিসুখকর গানে অনুষ্ঠানের সূচনার পরেই আসরে অবতীর্ণ হলেন অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্যোতিষ যে আদৌ বিজ্ঞান নয়, এ নিয়ে বেশ কিছু লেখা উৎস মানুষ পত্রিকায় কয়েক দশক আগে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে তা 'বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ' নামে সঙ্কলিত হয়ে বই হিসাবে প্রকাশ পায়। অমলেন্দুবাবুরও একটি প্রামাণ্য বই প্রকাশ করেছে উৎস মানুষ। কিন্তু বইতে পড়া আর সরাসরি তাঁর মুখ থেকে যুক্তিতর্কগুলো শোনায় বেশ ফারাক আছে, অমলেন্দুবাবুর এদিনের বক্তৃতা শুনতে শুনতে সেটাই মনে হচ্ছিল। সরস বাচনে যুক্তিতর্কগুলি মনের মধ্যে গেঁথে যাচ্ছিল।

জ্যোতিষের ধারণা জন্ম নিয়েছিল কীভাবে? কোথা থেকে? এই জায়গা থেকে অমলেন্দুবাবু তাঁর আলোচনা শুরু করেন। টলেমি, কোপার্নিকাস, জিওদার্নো ব্রুনোর মুখে বলার তত্ত্বের ধাপ পেরিয়ে কীভাবে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও তাঁর আবিষ্কৃত দূরবীনের দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন যে সত্যিই সূর্য স্থির আর তাকে কেন্দ্র করেই ঘুরে চলেছে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি। এতদিন পর্যন্ত এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত ছিল যে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলেছে সূর্য। গ্যালিলিওর এই প্রমাণ এতদিনের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের ওপরে বিরাট আঘাত হানল।

মহাকাশের এই রহস্যভেদ যাদের কায়েমি স্বার্থে আঘাত হেনেছিল, সেই পোপ ও ধর্মযাজকদের রোষদৃষ্টির ফলেই এইসব জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কী ধরনের শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছিল তার বর্ণনাও বক্তা অত্যন্ত মনোগ্রাহী করে উপস্থাপিত করলেন। এরপর তিনি পশ্চিম ছেড়ে পূবের দেশের জ্যোতিষ বিশ্বাস নিয়েও কিছু কথা বললেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিষ বিশ্বাসের পরিণতি কী হয়েছিল, স্বামী বিবেকানন্দ জ্যোতিষ বিষয়ে কী বলেছিলেন, তাও তিনি উল্লেখ করেন। রাশি মিলিয়ে তৈরি করা জন্মছক যে কতখানি ভ্রান্ত তারই প্রমাণস্বরূপ তিনি বললেন, মেক্সিকোর ভূমিকম্পে নিমেষে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু অথবা বড় ধরনের ট্রেন দুর্ঘটনায় একসঙ্গে অনেক লোকের মৃত্যুর কারণ কী এটা হতে পারে যে এইসব লোকেদের জন্মছক একইরকম ছিল?

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত না থেমে একটানা দাঁড়িয়ে থেকে স্লাইডের সাহায্যে সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিতে এই ৮৮ বছরের যুবকটি, তা শুনে ও তাঁকে দেখে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কুসংস্কারের বিরুদ্ধেআপসহীন এই সংগ্রামী সৈনিককে 'উৎস মানুষ' পত্রিকার পক্ষ থেকে জানাই অশেষ শ্রদ্ধা ও বিনম্র প্রণতি।

প্রতিবেদকঃ পূরবী ঘোষ

১) অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা দিচ্ছেন অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

২) সঙ্গীত পরিবেশন করছেন রাজশ্রী ভট্টাচার্য

৩) ও ৪) শ্রোতামণ্ডলী

স্বদেশে উপেক্ষিত ওআরএস-আবিষ্কর্তা

দিলীপ মহলানবিস

ওআরএস-এর পুরো কথা ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন। পুরো কথাটা না জানলেও ওআরএস শব্দটা এখন সবার জানা। পেটের গোলমাল বা ঘন ঘন বমি হলে ওষুধের দোকানে গিয়ে বললেই হয়। একটা প্যাকেট জলে গুলে নাও আর খাও। তাতেই জব্দ কলেরা, আন্ত্রিকের মতো বিপজ্জনক রোগও। বিশ্বখ্যাত পত্রিকা ল্যান্সেট একে 'দ্য মোস্ট ইমপরট্যান্ট মেডিক্যাল ডিসকভারি অভ দ্য টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি' বলেছিল। মজার কথা হল, এই আবিষ্কারটি গবেষণাগারে প্রথাগত গবেষণা থেকে হয় নি। ভয়ঙ্করভাবে ছড়িয়ে পড়া কলেরায় বিপন্ন লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষকে বাঁচানোর তাগিদে এটির উদ্ভব। এরা সবাই ছিল যুদ্ধের শিকার।

একটা সময় ছিল যখন কলেরা হলে তা মহামারী আকার ধারণ করত। গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেত। সাধারণের পরিভাষায় ভেদবমি হয়ে লোকে মারা যেত। রোগটি পরিচিত ছিল ওলাওটা নামে। রোগের হাত থেকে বাঁচতে একটি দেবীরও জন্ম হয়। প্রতিপক্ষের উদ্দেশে গ্রামীণ মহিলাদের অভিশাপ ছিল– ওলাওটা হয়ে মরবি। এ হেন ভয়ঙ্কর রোগ এখন অদৃশ্য। কোনো দেবীর পুজোও এর জন্য করতে হয় না। আর এর মূলেই আছে 'ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি'। কলেরা বা আন্ত্রিকের মতো রোগে বারবার বমি ও দাস্তের কারণে শরীর থেকে জল বেরিয়ে গিয়ে তৈরি হত জলসঙ্কট। সেটাই হয়ে উঠত মৃত্যুর বড় কারণ। শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া জল ঢুকিয়ে দেওয়ার একটাই পদ্ধতি ছিল– ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে শিরার মধ্যে দিয়ে স্যালাইন, মানে নুন-জল ঢুকিয়ে দেওয়া। পরিভাষায় ইন্ট্রা ভেনাস বা আইভি। এটা এক-দুজনের ক্ষেত্রে হলে সমস্যা ছিল না। কিন্তু মহামারী হলে লক্ষ লক্ষ লোককে আইভি দেওয়া সম্ভব হত না। কারণ এটি দিতে গেলে প্রশিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন হত। এই সমস্যা সমাধানেই শুরু হয়েছিল ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি (ওআরটি) নিয়ে গবেষণা। মানে মুখ দিয়ে জল খাইয়ে শরীরের জলাভাব পূরণ করা। ওআরটি নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছিল সেই ১৯৪০-এর দশকে। কিন্তু এটা চরম পরিণতি পায় ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগে বাংলাদেশের ঢাকায় এবং ভারতের কলকাতায়। তখন অবশ্য বাংলাদেশ ছিল পূর্ব পাকিস্তান।

কে পেনিসিলিন আবিষ্কার করেছিলেন, কে কালাজ্বরের প্রতিষেধক তৈরি করেছিলেন ইত্যাদি তথ্য আমরা সাধারণজ্ঞানের বই থেকে পেয়ে যাই। কিন্তু ওআরএস-এর মতো যুগান্তকারী আবিষ্কার, যা লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বাঁচায়, তার আবিষ্কারকের খোঁজ রাখি না। অথচ তিনি একজন বাঙালি চিকিৎসক তথা চিকিৎসা বিজ্ঞানী, আমাদের হাতের কাছের মানুষ। নাম দিলীপ মহলানবিশ। আমরা রাম-শ্যামকে ধরে ভারতরত্ন দিই, পদ্মভূষণ-পদ্মশ্রী দিই, বঙ্গভূষণ দিই, বিশ্ববিদ্যালয় অকাতরে ডক্টরেট বিলি করে– উপেক্ষিত থেকে যান দিলীপ মহলানবিসের মতো মানুষ। অশীতিপর দিলীপবাবু অবশ্য এসব গায়ে মাখেন না। বরাবরই প্রচারের আড়ালে থেকে কাজ করতে ভালবাসেন। ঘটনাচক্রে তাঁর নাম নোবেল পুরস্কারের জন্য একাধিকবার গেলেও, তাঁর পুরস্কার পাওয়া হয় নি। তবে

রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি তাঁকে সদস্য মনোনীত করে সম্মান জানিয়েছে। যে সম্মান এ দেশে কজন পেয়েছেন, কর গুনে বলা যায়। **উৎস মানুষের পক্ষে চিত্ত সামন্ত, বরুণ ভট্টাচার্য ও সমীরকুমার ঘোষ শুনতে গিয়েছিল তাঁর কাজের কথা।**

■ **প্রথমে আপনার ছোটবেলার কথা একটু শুনব।**

দিলীপঙ্কর আমার জন্ম অবিভক্ত বাংলাদেশে, মানে পূর্ব পাকিস্তানে। কিশোরগঞ্জ সাব ডিভিসনের বাজিতপুরে থাকতাম। ওটা ছিল এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বাবা বিএসসি পাস করে আইন নিয়েও পড়েছিলেন। বাজিতপুর আদালতে ওকালতি করতেন। তাই ওখানেই এক স্থানীয় স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ি। আমাদের গ্রামেই থাকতেন বিশিষ্ট গায়ক দেবব্রত বিশ্বাস। কাকার বন্ধু ছিলেন। বাড়িতে বসত আড্ডা, নিয়মিত আসতেন। সপ্তম শ্রেণীতে উঠে চলে যাই কিশোরগঞ্জে। মানে আমরা ক্রমশ দেশছাড়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছি। কারণ বাংলাদেশে, মানে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ডামাডোল শুরু হয়ে গিয়েছে। ওখানে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ি। তারপর ওখানকার পাট তুলে চলে আসি এই বাংলায়। বরানগরে। থাকতাম গঙ্গার কাছেই, ফ্ল্যাটে। এখানে এসে ভর্তি হই হেয়ার স্কুলে, নবম শ্রেণীতে। সেখান থেকেই ম্যাট্রিক পাস করি। স্কুলের পাশেই প্রেসিডেন্সি। সেখানেই ভর্তি হওয়ার কথা। কিন্তু বাবা-কাকারা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্ত, ফলে বেলুড়ে রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরে ভর্তি হই আইএসসি পড়তে। পাস করার পর আমার ইচ্ছা ছিল ডাক্তারি পড়ার। ইঞ্জিনিয়ারিংয়েও সুযোগ পাই। শেষমেশ ভর্তি হই ডাক্তারিতেই। সেটা ১৯৫৪। তখন সচ্ছল পরিবারের ছেলেরাই ডাক্তারি পড়তে আসত। পাঁচ বছর ডাক্তারি পড়ে, ছ মাস প্রি-রেজিস্ট্রেশন ক্লিনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, তারপর ছ মাস রেসিডেন্ট। মানে হাউস ফিজিশিয়ান। মেডিক্যাল কলেজে শিশু নিবাস নামে একটা চিলড্রেন হাসপাতাল ছিল। তখন বেশিরভাগ ছাত্র চাইত অবস্টেট্রিক্স গাইনোকলজি বা জেনারেল মেডিসিন খনও ভাল ছিল না। রেসিডেন্ট ডাক্তারের চেয়ে রোগী বেশি। তখন একটা মরক লাগল। একেবারে মুমূর্ষু শিশুরা আসতে লাগল। একে অপুষ্টি, তার ওপর ডায়ারিয়া। ওইখানে ১৬-১৭ ঘণ্টা কাজ করতাম। এমন হত, যে রাতে শুয়েও নিস্তার পেতাম না। হাসপাতালের হস্টেলে যে ঘরে থাকতাম, তার দরজাটা খোলাই থাকত। যখন-তখন কলবুক নিয়ে ডাকতে চলে আসত। দরজায় ছায়া পড়লেই বুঝতে পারতাম, ডাক এসেছে। এক বছর কাজ করার পর সিনিয়ার পজিশনে গেলাম। ছ মাস কাজ করলাম। মাস্টারমশাই বললেন, তুই তো ভালই কাজ করিস। এবার তোর ফেলোশিপের ব্যবস্থা করা যাক। আমি বললাম, স্যার এ যা কাজ আমি পারব না। বললাম বটে, তবে ভাবছি কোথায় যাওয়া যায়। সবাই বলল ইংল্যান্ডে চলে যাও। ওখানে তখন ন্যাশনাল হেল্‌থ সারভিস চালু হয়েছে। ওদের প্রচুর ইয়াং ডাক্তার দরকার। ইচ্ছা হলেই তো হল না, কী করে যাই। কম করেও ৬০০-৭০০ টাকা লাগবে। দিদি তখন স্কুলের শিক্ষিকা। সাহায্য করল। ট্রেনে থার্ড ক্লাসে বোম্বে, সেখান থেকে জাহাজ। আমার কিছু বন্ধু আগেই চলে গিয়েছিল। ওরা বলল চলে আয়। রওনা হলাম। এখানে আমার দেড় বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকায় ওখানে সিনিয়র রেসিডেন্ট হয়েই যোগ দিলাম। বস খুব বিখ্যাত। উঁচুমানের গবেষণা করতেন। ওখানে যে বাচ্চাই জন্মাক, তাকে নিয়ে লেগে পড়তে হত। এখানে কাজ করেছি মরক লাগার মতো। ওখানে গভীরভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ওখানকার প্রশিক্ষণটা খুব কাজে আসে। দেড় বছর সিনিয়ার রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ করার পর আবেদন করি, লন্ডনের বিখ্যাত শিশু হাসপাতালে। রেসিডেন্ট হাউস ফিজিশিয়ান। ওখানে বিদেশিরা খুব একটা সুযোগ পায় না। ওদের দেশের লোকেদের মধ্যে খুব প্রতিযোগিতা ছিল। অস্ট্রেলিয়া থেকে এক-দুজন ছিল। সবাই প্রায় শ্বেতাঙ্গ। এমআর সিপিও করে ফেললাম। ওরা আমাকে রেজিস্টার পদে নিল। ওখানে ছিলেন ডঃ উইনিফ্রেড ইয়াং। নামকরা বিজ্ঞানী। ওঁর অনেক পাবলিকেশন ছিল। আমি ওঁর অধীনে যোগ দিলাম। সকলে বলল, ওরে বাবা, তুমি উইনিফ্রেডের অধীনে, ও তোমাকে খাটিয়ে মেরে ফেলবে! আমি বললাম, আমাকে তো টিকতেই হবে। কোথায় যাব! সেখানে রেজিস্টার হিসাবে দেড় বছর কাজ করার পর চলে যাই আমেরিকায়। সেটা ১৯৬২-৬৩ সাল হবে। ওখানে মেডিকেল কেয়ার তৈরি করেছিল। ওটা যাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ, তাদের দেখাশোনার জন্য। হাসপাতালটা ছিল জন হফকিন্স ইনস্টিটিউটের অংশ। ওখানে আবেদন করি। ঘটনাক্রমে ওখানকার ডাঃ কুক ছিলেন উইনিফ্রেড ইয়াংয়ের পরিচিত। ওঁর কাছে অধীত বিদ্যা ওখানে প্রয়োগ করি। কিন্তু ও দেশে আমার বেশিদিন কাজ করা হল না। ইংল্যান্ডে যাওয়ার আগেই বিয়ে করে ফেলেছিলাম। স্ত্রী দেশে। তখন লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে পদার্থবিদ্যা পড়াত। ওর জন্যই দেশে ফিরতে হল।

আমেরিকার জন হপকিন্সে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল। আমেরিকা থেকে মেডিকেল ফেলোশিপ নিয়ে চলে এলাম দেশে।

■ **ওআরটি, মানে ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি নিয়ে কাজ শুরু করলেন কবে? কোথায়?**

দিলীপঙ্কর ওই যে উইনিফ্রেড ইয়াংয়ের কথা বলেছি, উনি এটা নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। চার-পাঁচটা স্পেশাল বেড ছিল। ওখানে আইভি ((ইন্ট্রা ভেনাস) ড্রিপ এবং ওআরএস ইত্যাদি নিয়ে কাজ করত। ফলে ওটা সম্পর্কে আমার কিছুটা পরিচয় ছিল।

তখন মেডিকেল কেয়ার ফেলোশিপ বলে একটা জিনিস ছিল। ডাক্তারদের দেশে ফেরানোর জন্য। ওরা ছশো টাকা করে দেবে বলল। আমি মেডিকেল ফেলোশিপ নিয়ে দেশে চলে এলাম। এখানে ফিরে আসার পরও জন হপকিন্সের সঙ্গে যোগাযোগটা ছিল। সেই সময় আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার পর মেডিকেল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (আইসিএমআরটি) থেকে কিছু অল্পবয়সী ছেলে এদেশে এসেছিল। হপকিন্সের ছাত্র। ওদের একটা দল কলকাতায়, আরেকটা পাঞ্জাবে ছিল। উন্নয়নশীল দেশে ওরা আসত অভিজ্ঞতা বাড়াতে। ওরা বলল তুমি আমাদের সঙ্গে কাজ করবে? আমি রাজি। শুরু করলাম বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে। সেখানে হপকিন্স গ্রুপের একটা গবেষণাগার ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র সবই ছিল। সেখানে যোগ দিলাম। আইডিতে যারা আসত তারা বয়স্ক। এদিকে ওরা তো বাচ্চার 'হেড এন্ড', 'ফুট এন্ড' কী তাও জানে না! ওরা বলল, আমাদের একটা পেডিয়াট্রিসিয়ান দরকার। তুমি তো ওখানে কাজ করেছ, তুমি বাচ্চাদের দিকটা দেখো। ওটা আমরা দেখতে পারব না। ওইখানেই শুরু করলাম ওআরএসের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সেটা ১৯৬৬ কি ৬৭ হবে।

প্রথমে মেটাবলিক ব্যালান্সটা স্টাডি করে দেখে নিলাম বাচ্চাদের ওপর যদি ওআরএস খাওয়াতে যাই, তাহলে কী করতে হবে। ওআরএস-এর একটা মহড়াও দিলাম। কিন্তু পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই ওরা চলে গেল। জন হপকিন্সের সঙ্গে ওদের যে চুক্তি ছিল তা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ওরা চেষ্টা করছিল সময়সীমা বাড়ানোর, হয়নি।

সেই সময়েই শুরু হল বাংলাদেশ যুদ্ধ। বাংলাদেশ থেকে বিপুল শরণার্থী আসতে লাগল। সেই সময় ওই আইডি হাসপাতালে গবেষণার কাজ করতে করতে ওআরএসের কাজটা নিয়ে পরীক্ষা চালিয়া যাচ্ছি। আমার সঙ্গে যে অ্যাডাল্ট মেন্টর ছিল, ওরা বলল তাড়াতাড়ি করতে হবে। ওরা চায় আগেই পেপার ছাপিয়ে ফেলতে। আমি তত তাড়াতাড়ি করার লোক ছিলাম না। যাই হোক, সেই সময় তৈরি হয়ে গেল ওআরএস। কাজটা ভালভাবেই হল। ওরা যখন চলে গেল। তখন ৭১-এ লক্ষ লক্ষ লোক চলে আসতে লাগল। একটা বিরাট মহামারী, কলেরা।

■ বাংলাদেশ শরণার্থী আর মহামারীই কি আপনার গবেষণাকে পরিণতি দিল?

দিলীপদা অনেকটা তাই। নেট পিয়ার্স বলে একজন গবেষণা করেছিল ওআরএস নিয়ে। আমারই সমসাময়িক। হপকিন্সে। ওআরএস নিয়ে ওরা ট্রায়াল দেয়নি। আমার কাছ থেকে অনেক পরামর্শ নিয়েছিল। নেট বলল, তুমি বাচ্চাদের ওপরে ট্রায়াল দেবে। কিন্তু আমি বাচ্চাদের মেটাবলিক স্টাডি না করে করব না। ওরা যখন যাচ্ছে সেই ৬৮-৬৯ সালে আমি আমার ওআরএসের কাজটা শেষ করলাম। কিন্তু পাবলিকেশন করতে পারিনি। শেষ করলাম, কারণ ওদের তো চলে যেতে হবে। আর সেই সময় এসে গেল ১৯৭১। ওরা কিছু রিলিফ ফান্ড এনে, এখানে এসেছিল। ওদের চলে যাওয়ার পর আরেকজন এসেছিল, সে আবার মেরিন বায়োলজির লোক। ওর নাম আমার গবেষণায় আছে। ও বলল, তুমি যা করতে চাও করো, আমি তো মেরিন বায়োলজির লোক, ওসবের কিছু জানি না। এদিকে মহামারী বড় আকার ধারণ করেছে। চারদিক থেকে ফান্ড আর চ্যারিটেব্‌ল সাহায্য আসতে শুরু করল। সেই সময় আমি বললাম, গবেষণা বন্ধ থাক, আমি চললাম সীমান্তে। বনগাঁ আর বারাসতের ওদিকটায়। একটা টিম তৈরি করে নিলাম। ওরা ডাক্তার নয়, প্যারামেডিকেলও বলা যায় না। কিছু স্থানীয় যুবক। গবেষণার জন্য এমনি নিয়েছিলাম। ওদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিলাম। বললাম, আমি যা করব, তোমাদের করতে হবে। ওরা তখনও বোঝেনি কাজটা কী। লিকুইড স্টুল নিয়ে মাপি, বিশ্লেষণ করি। ওদের তো কাণ্ডকারখানা দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। তবে আস্তে আস্তে শিখে যায়। ওরা সবে ম্যাট্রিক পাস করেছে কি করেনি। ওদের নিয়ে আমি সীমান্তে চলে গেলাম। প্রথমে গাদা গাদা আইভি (ইন্ট্রা ভেনাস) আসত সারা পৃথিবী থেকে। আমি দেখলাম, আইভি দিয়ে ম্যানেজ করা অসম্ভব। একটা লোককে ড্রিপ চালাবার জন্য দিচ্ছি, তার চারদিকে গাছের শাখার মতো হাত টেনে টেনে আইভি চালাচ্ছি। এভাবে সামলানো অসম্ভব। যা আইভি আছে, তা দিয়ে সামাল দেওয়া যাবে না। তখন আমি আমার ওই পরীক্ষাটা কাজে লাগালাম। বড় বড় ড্রামে ওআরএস গোলা হল। রোগীর সঙ্গে যে আত্মীয়স্বজন আসছে, তাদের বললাম খাওয়াতে। একেবারে ম্যাজিক ফল মিলল। যেখানে মৃত্যুহার ছিল ৩০ শতাংশ, তা নেমে এল দু-তিন শতাংশে। ওখানে বড় বড় তাঁবু ফেলা ছিল। আমাদের নিজেদের একটা জায়গা ছিল। সেখানে এক শতাংশে নেমে এসেছিল। সেটা নিয়ে একটা পেপার প্রকাশ করেছিলাম।

জন হপকিন্সের যে অফিস ছিল, সেখানে গ্লুকোজ, সল্ট দিয়ে কনভেয়ার বেল্টের মতো যন্ত্রে বড় বড় প্লাস্টিকের প্যাকেট (১৬ লিটারের) আগুনে সিল করে পাঠিয়ে দিতাম। হপকিন্স থেকেই বলল, দিলীপ তুমি লেখাটা আমাদের পাঠিয়ে দাও, নাহলে অন্যরা নিয়ে নেবে। তখন ঢাকাতেও কিছু কিছু আমেরিকান কাজ করছিল। মোটামুটি একটা জায়গায় গিয়ে পাবলিকেশনটা করা হল। পরে ওটা ইমপ্রুভ করে ডাঃ মিশ্র। হপকিন্স জার্নালে বেরোতে বেরোত একটু দেরিই হয়ে গেল। সেটা ১৯৭৩। অবশ্য তার আগেই লোকে জেনে গেছে, আমাদের কাছে ওআরএস আছে। এসে নিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেভ দ্য চিলড্রেন ফান্ড প্রভৃতি বহু সংস্থা থেকে অনুরোধ আসত, আমাদের দাও। আমরা পাউডার বানিয়ে দিতাম। আমরাই

পরে চেষ্টা করলাম ওআরএসের প্যাকেট বার করতে। স্বাভাবিকভাবেই যেটা ইন্ডাস্ট্রি করতে পারে, সেটা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব হল না। স্বল্প সময়ের জন্য প্যাকেট ভালই কাজ করত। পরে নানান কোম্পানি বিউটিফাই করার জন্য এটা-ওটা মেশানো, চিনি বেশি দেওয়া ইত্যাদি করতে লাগল। তখন আমরা সব দল পাকিয়ে সরকারের সঙ্গে কথা বললাম। বললাম, এটা হতে পারে না। সরকারকে রাজি করালাম। এইভাবে ওদের ঠেকালাম। সেটা করাতে অন্তত ওআরএস নিয়ে বাণিজ্যিক সংস্থার যথেচ্ছ ব্যবসা করাটা হয়নি।

■ বাণিজ্যিক সংস্থা করলে অসুবিধেটা কী ছিল?

দিলীপদ্ম ওরা জিনিসটা বিক্রির জন্য নানা সুগন্ধ আর চিনি মেশাত যথেচ্ছ। চিনি বেশি দিলে হিতে বিপরীত হতে পারে। যাকে বলে 'অসমোটিক ডায়ারিয়া।'

■ ওআরএস নিয়ে আপনার পেপারটাই কি প্রথম?

দিলীপদ্ম না, পাবলিকেশন তার আগেও হয়েছিল। আমেরিকা থেকে যারাই আসত, তাড়াতাড়ি করে একটা লেখা ছাপিয়ে ফেলত। ওদের কাছে ফিল্ড স্টাডির কাজটা ছিল না। ওরা গবেষণাগারে কাজ করল। আমরা একেবারে ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে গেছি।

এই যে আবিষ্কার, তার পেটেন্ট করিয়েছেন?

না, এটার কোনো পেটেন্ট নেই। আমরাই সরকারকে রাজি করালাম, যাতে কোনো অবস্থাতেই পেটেন্ট করা না হয়। কেন্দ্র সরকার আমাদের কথা শুনে পেটেন্ট করতে দিল না। এখন কিন্তু কোনো পেটেন্ট নেই।

■ এটা তো অবাক কথা। আপনারাই পেটেন্ট করতে দিলেন না! কারণ কী?

দিলীপদ্ম পেটেন্ট না করানোর কারণ তাতে ওষুধ কোম্পানিগুলো অহেতুক দাম বাড়াত। চিনি বেশি দিত ইত্যাদি। আমাদের শঙ্কা ছিল, যদি স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন না থাকে। তখন আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে (হু) দিয়ে ওআরএস বানাতে লাগলাম। হু আর ইউনিসেফ মিলে তৈরি করত। লক্ষ লক্ষ প্যাকেট তৈরি হতে লাগল। ততক্ষণে আমি হু-তে চলে গেছি। সারা পৃথিবীতে ঘুরছি। ডাঃ ধীমান বড়ুয়া হু সদর দপ্তরে ছিলেন। আমাদের শিক্ষক ছিলেন। উনি অনেক লড়াই করেন আমার জন্য। বলেন, দিলীপ চলো, তোমাকে এখান থেকে বার করে নিয়ে যাই। তুমি খালি সাদা কাগজে লিখে দাও, তুমি রাজি। ডিরেক্টর জেনারেলের সঙ্গে ডাঃ বড়ুয়ার পরিচয় ছিল। ওঁকে দিয়েই কাজটা করালেন। দেশ থেকে না বের করলে অন্য জায়গায় গিয়ে কাজ করব কীভাবে। ৩০টা দেশে আমি নিজেই গেছি। কেননা যারা পেডিয়াট্রিসিয়ান, ফ্যাকাল্টি মেম্বার, তাদের কনভিন্স করতে হবে।

বিদেশে রোগী ভর্তি করে আইভি ড্রিপ দিতেই হত। তাতে প্রচুর ঝামেলা। প্রচুর খরচা। ওসব দেশে তো সব ধরনের লোক আছে। বিশেষত আমেরিকানরা। ওদের কিছু হলেই আইভি দিয়ে দেবে।

আমেরিকাতেও কি আন্ত্রিকের প্রকোপ আছে?

হ্যাঁ, ওখানেও ডায়ারিয়া হত। তবে তা নির্ভর করত আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর। ডায়ারিয়া হত নীচু শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে।

■ এত গুরুত্বপূর্ণ একটা আবিষ্কার, যা লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বাঁচিয়ে দিচ্ছে, তা নিয়ে তো তেমন সাড়া পড়ে নি?

দিলীপদ্ম ঘটনা হল, এই আবিষ্কারটা মোটেই ফ্যাসিনেটিং কিছু নয়। তাই লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বাঁচালেও সাধারণের মধ্যে তেমন হইচই হয়নি। বিদেশে তো এটাকে সেকেন্ড ক্লাস ট্রিটমেন্ট বলত। কিন্তু এটা ফার্স্ট ক্লাস, আগে থেকে দিতে পারলে। ডায়ারিয়ায় খুব খারাপ অবস্থা যে হয়, এতে অতদূর যাবেই না। সেটা সব জায়গাতেই আস্তে আস্তে প্রমাণ হয়ে গেল। একটা উদাহরণ দিই। আলেকজান্দ্রিয়া চিলড্রেন হসপিটালে ১২০০ বেড। ওরা হু-কে লিখেছে, এগুলো আমরা সব করে নিয়েছি, উই ডোন্ট বিলিভ ইট ওয়ার্কস। এই ঘটনাটা খুব মজার কেন না, এতগুলো পেশেন্ট। ওরা আউটডোরেই সামলে উঠতে পারে না। আইভি দিয়ে দু-চার ঘণ্টা রেখে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। পরে আবার আসে। ওরা পরিষ্কার লিখে দিল, ওরা ওআরএস-এর কথা বিশ্বাস করে না। তখন ওখানে যিনি কোঅর্ডিনেটর তিনি বললেন, দিলীপ তুমি চলে যাও। ওদের না দেখালে হবে না। গেলাম। ওরা বলল, আমাদের দেখাও, এটা কাজ করে। একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার, একজন প্রফেসর, একজন ডিমন্সট্রেটর এল। বললাম, নিয়ে এসো কয়েকটা বাচ্চা। ওদের বিরাট আউটপেশেন্ট বিভাগ। চার-পাঁচটা রোগী নিয়ে এল। একটা একটু বেশি বমি করছে দেখে ওরা ঘাবড়ে গেল। বমি করলেও দেওয়া যায়। তবু বললাম, ওটা বাদ দাও। বাকি চারটেকে ওআরএস খাওয়ানো হল। কাজ হল দেখে ওরা বলল, চলো রিপোর্ট করা যাক। ওদের যে লেকচারার আর ডেমনসট্রেটার ছিল, তারা বিশ্বাস করল। বাকিরা তর্কাতর্কি শুরু করল। তার মানে, হাতেকলমে না দেখিয়ে দিলে বিশ্বাস করবে না। তিরিশটা দেশে আমি নিজে কাজ করেছি। বাকিগুলোতে হল ভাষার সমস্যা। ওখানে যাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি তাদের পাঠাতে হল। যেমন আফ্রিকায়। তারপর আমেরিকায় ওটা চালু হল। আমেরিকাতেও ওদের বিশ্বাস করানো কঠিন হয়েছিল। আসলে ওরা ভয় পায়। ওদের কাছে 'দিজ ইজ টু সিম্পল'। এত সহজে এত বড় কাজটা হয়, এটাই ওদের মধ্যে অবিশ্বাস তৈরি করে। একটি ছেলে জন হসকিন্সের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, দক্ষিণ ভারতীয়। বলল, দিলীপই এটা এখানে চালু করল। ও আমার হয়ে খুব ফাইট করল। আমাকে দেখে উৎসাহ পেয়েছিল। বলেছিল, এটা ফার্স্ট ক্লাস ট্রিটমেন্ট। তারপর আস্তে আস্তে ব্যাপারটা ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

■ **আপনাকে নিয়ে তার মানে বিস্তর টানাটানি হয়েছে?**

দিলীপঙ্কর আমাকে নিয়ে টানাটানির কারণ হল, আমেরিকা থেকে কাজ করতে আসত, তারা ইনটার্ন। তারা পরিণত বয়সের লোকেদের নিয়ে কাজ করত। এদিকে পুরো প্রোগ্রামটা হল পাঁচ বছরের কম বয়সীদের। বছরে ৪০-৫০ লাখ শিশু মারা যাচ্ছে। সেখান থেকে নেমে প্রথমে ২০ লাখে, পরে দশেরও কমে। সংখ্যাটা মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলোর। আফ্রিকা, এশিয়া ইত্যাদি দেশগুলোর। ইউরোপেও যে ডায়ারিয়ায় মারা যেত না তা নয়। ওরা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করত। হাসপাতালে একটা ডায়ারিয়া ওয়ার্ড থাকত। ওআরএস জনপ্রিয় হওয়ার পর পরে দেখেছি, হাসপাতাল থেকে ডায়ারিয়া ওয়ার্ডটাই উঠে গেছে। আগে ডায়ারিয়ার চিকিৎসা হত আইভি দিয়ে। তখন যেসব অ্যাম্পুল আসত সেগুল আবার পাইরোজেন ফ্রি নয়, ফলে ভীষণ কাঁপুনি হত। অসুবিধে যে হয়নি তা নয়, তবে আমরা চেষ্টা করতাম পাবলিসিটি না করে কাজটা করতে।

■ **পরের দিকে আর গবেষণা হয় নি?**

দিলীপঙ্কর তারপরেও অনেক কাজ হয়েছে। আমরাই করেছি, সিরিয়াল বেস্‌ড ওআরএস। সত্যি বলতে কি সিরিয়াল বেস্‌ড ওআরএস, এমনি ওআরএস-এর চেয়ে ভাল কাজ করে। কিন্তু হু, ইউনেস্কো বলল, একটা স্ট্যান্ডার্ড না রাখলে আজকে এই কোম্পানি এটা করবে, কালকে আরেকজন। সেটাই ছিল সমস্যা। আর স্টেবিলিটির সমস্যা আছে। সিরিয়াল বেস্‌ড ওআরএসের যে স্টাডি তার ট্রায়ালটা এখানেই করেছি। সিরিয়াল মানে আপনি ভাবছেন ভাত, ডাল দিয়ে কী করে করব! আমার তো চাই নুন তিন রকমের আর চিনি বা গ্লুকোজ। গ্লুকোজ বা চিনির বদলে আমি সিরিয়াল মানে শস্য দিলাম। সেটা কী করে দেব। ভাত রান্না করে দিলে তা প্র্যাক্টিক্যাল হবে না। তখন খই কিনলাম। বস্তা বস্তা খই। ওটা গ্রাইন্ডারে গুঁড়ো করে নিলাম। খই আর তিন রকমের যে সল্ট আছে, দিয়ে প্যাক করলাম। খইয়ের সুবিধে, এটা বেশি দেওয়া যায়। কারণ ওই অসমোটিক প্রবলেমটা নেই। এখানে আমরা কুড়ি গ্রাম গ্লুকোজ দিতাম, সেই জায়গায় ৩০-৪০ গ্রাম খই দিয়ে দিলাম। এই স্টাডিটাও আমরা প্রকাশ করেছিলাম। এটা যে ছেলেটা করত, সে তো পরে পাগল হয়ে গেল!

■ **এখন তো অনেক কোম্পানিই ওআরএস তৈরি করছে?**

দিলীপঙ্কর এখন অনেকগুলো স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানি ওআরএস তৈরি করে। সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থাও করে। ব্যাপারটা এখনও সরকারি নিয়ন্ত্রণে আছে। তবে ছোট মাপেও এটা তৈরি করা যায়। এমনকি বাড়িতেও। তবে করে বেশিদিন রাখা যায় না। শুকনো অঞ্চলে যদি ভাল করে সিল করা যায় তবে হয়। আর এই পলিথিনগুলো বাতাসরোধী নয়। এখানে আর্দ্র জায়গায় খুলে রাখলেই মুশকিল। পরে আমরা স্ট্যান্ডার্ডাইজড প্লাস্টিকের চামচ তৈরি করেছিলাম। ওতে নুন দিন, চিনি দিন। ব্যস।

■ **ওআরএস-এর প্যাকেট খুলে ফেললে কী আর রেখে দেওয়া যায় না?**

দিলীপঙ্কর প্যাকেট খুলে ফেলার পর সেটা কতদিন ভাল থাকবে তা নির্ভর করবে তা কী দিয়ে তৈরি তার ওপর। সাইট্রেট বা অ্যাসিটেট দিলে বেশিদিন থাকবে, বাইকার্বোনেট দিলে থাকবে না। এগুলো কতগুলো ব্যাপারের ওপর নির্ভর করে। ঠিক মতো রাখলে বেশ কিছুদিন থাকবে। অনেকে রেফ্রিজারেটরে রাখে। কিছু হয় না।

■ **কোন জলে তৈরি করব, তার কোনো মান আছে?**

দিলীপঙ্কর যে জলটা খাওয়া যায়, তা দিয়েই তৈরি করা যায়।

■ **শেষ প্রশ্ন। এতবড় কাজ করলেন। হু জানে, ইউনেস্কো জানে, জন হপকিন্স ইনস্টিটিউট জানে তবু কোনো পুরস্কার পেলেন না। কোনো লবি কাজ করেছে?**

দিলীপঙ্কর প্রথমে জানাই, আমি কাজটায় বিশ্বাসী। কাজটা মনপ্রাণ দিয়ে করে গেছি। পেপার ছাপানোর দিকেও অত গুরুত্ব দিই নি। এতে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বাঁচছে এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে? তবে বললেন যখন তখন জানাই, নোবেল কমিটির কাছে অনেকবারই আমান নাম গেছে। মুশকিল হল, ওরা সর্বোচ্চ তিনজনের বেশি দেয় না। কিন্তু দাবিদার চারজন। শুনেছি আমার নাম নিয়ে ওদের কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু বাকি তিনজনের কোন দুজনকে দেবে, তা ঠিক করে উঠতে পারে নি। রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি নোবেল দিতে না পারলেও আমাকে ওদের সদস্যপদ দিয়েছে। এটাও মস্ত বড় সম্মান। এতে আমি কাউকে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারে মনোনীত করতে পারি। আমাদের দেশে খুব কম জনই এই সম্মানের অধিকারী। এছাড়া বেলেঘাটা আইডিতে আমার নামে একটা ল্যাবরেটরি আছে। রাজ্যপাল স্বয়ং অর্ডার দিয়েছিলেন। আমি এখনও সেখানে গিয়ে গবেষণা করতে পারি। কেন্দ্রীয় সরকারি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর কলেরা অ্যান্ড এন্টেরিক ডিজিজ-এর সদস্য। থাইল্যান্ডের রাজাও আমাকে পুরস্কৃত করেছেন।

■ **কিন্তু দেশে? নিদেন একটা পদ্মশ্রীও কি প্রাপ্য ছিল না? বা রাজ্য সরকার যে কত রকমের পুরস্কার দিচ্ছে তাও কি পেতে পারতেন না?**

দিলীপঙ্কর বললে, একটু বড় কথা মনে হবে, তবু আগের কথাটাই বলি, পুরস্কারের জন্য কাজ করি নি। বিজ্ঞান যেটুকু জানি তার প্রয়োগে বহু মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পেরেছি, এটাই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আর পুরস্কার পেলেই সে খুব বড় কাজ করেছে বা মহান বিজ্ঞানী, এমনটাও আমি বিশ্বাস করি না। আজ এইটুকুই। নমস্কার।

উমা

এ রাজ্যে খুচরো ব্যবসাঙ্ম প্রথা পরিবর্তন জরুরি

শৈবাল কর

পশ্চিমবাংলায় নাকি প্রায় ৩০ লক্ষ হকার, সাদা বাংলায় যাদের আমরা ফেরিওয়ালা বলে জানি, প্রতিদিনের খুচরো ব্যবসায় লিপ্ত থাকেন। এর মধ্যে শুধু কলকাতায় রয়েছেন প্রায় ৩ লক্ষ হকার। যদি ধরে নেওয়া যায়, রাজ্যের পরিবারগুলির গড় লোকসংখ্যা পাঁচজন, তাহলে এ রাজ্যের প্রায় দেড় কোটি মানুষ এই প্রাত্যহিক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত এবং জীবনধারণের প্রয়োজনে নির্ভরশীল। খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে, এই বিপুল জনসংখ্যার জীবনধারণের সংস্থান অনিশ্চিত এবং সরকারি মর্জির উপর অতি-নির্ভরশীল হওয়ার দরুন এ রাজ্যে চালু অর্থনীতি পাঠ্য পুস্তকের মডেল অর্থ-ব্যবস্থার মতন আচরণ করবে না। এর পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে— তার কয়েকটি এখানে আলোচনা করার প্রচেষ্টা করা যেতে পারে।

প্রাথমিক স্তরে যে ব্যবসাকে পণ্য ফেরি করা বলে চিহ্নিত করা যায়, তা আর পাঁচটা স্থায়ী ব্যবসার মতন হতে পারে না। ফেরিওয়ালার ব্যবসার ধরনে যে অনিশ্চয়তার প্রসঙ্গ ওঠে তার অন্যতম সূত্র হল, এই ব্যবসা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসে হওয়ার কথা নয়। অন্তত, সেই নিলামবালার যুগে, যা নেবে তাই ছ আনার গান গেয়ে, ছুরি-কাঁচি, চুলের ফিতে, চিরুনি বিক্রির প্রথা, সত্তর সালের প্রথম দিকেও অস্ফুটে দেখা ছবির মতন মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। নিশ্চিত করে বলা শক্ত ততদিনে কলকাতা এবং মফস্বলের সমস্ত শহরে, রেল স্টেশনের আশেপাশে বিক্রির ঝুলি নিয়ে মানুষ আসলে চিরস্থায়ী বসে পড়েছেন কি না। কিছুটা গল্পে শোনা বা তৎকালীন সাদা-কালো দূরদর্শনে প্রচারিত শনিবার বা রবিবারের বাংলা পুরনো ছায়াছবিতে দেখা ধারণার প্রকাশ থেকেও এই জাতীয় কল্পনার সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে যে, ফেরিওয়ালার ব্যবসা আসলে সাময়িক। এর স্থায়িত্ব অল্পদিনের, নির্দিষ্ট অঞ্চলে কিছু সময়ের জন্য এদের দেখা পাওয়া যায় এবং তারপর আবার পরের দিন একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। উত্তর কলকাতা এবং রাজ্যের অন্য ছোট-মাঝারি শহরেও সন্ধ্যেবেলা কুলপি মালাই, ফুচকা-ঘুগনি আর দিনের বেলায় নানা রকমের পসরা নিয়ে হাজির হওয়ার কথা পুরনো কলকাতা নিয়ে লেখা যে কোনো বইতেই পাওয়া যায়। রবি ঠাকুরের বাড়ির সামনে দিয়ে সন্ধ্যেবেলায় বেলফুলের মালা হেঁকে যাওয়ার কথা কে না পড়েছেন? তাঁরা সম্ভবত এখনও আছেন, কিন্তু কোনো কারণে এঁদের দেখা না গেলেও এ রাজ্যের অধিকাংশ রাস্তার কোণে একজন স্থায়ী বিক্রেতার দেখা মিলবে। বেলফুলের মালা যে খোঁপায় জড়ানোর কথা সেখানেই জড়াবে, আপনাকে হয়ত দু-পা বেশি হাঁটতে হবে।

এই পরিবর্তন আশ্চর্য নয়— রবি ঠাকুরের ছেলেবেলার সেই দিনগুলোর থেকে সময়টা এগিয়ে গিয়েছে একশো ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর। নিয়ম পাল্টাবে না? দেশ বদলাবে না? যে বঙ্গভঙ্গ রোধে রবি ঠাকুর গান বেঁধেছিলেন, রাখিবন্ধন উদ্‌যাপন করেছিলেন, সেই বঙ্গভঙ্গ শেষ পর্যন্ত রোধ করা গিয়েছে কি? যায় নি। এর ফলে দুই বাংলার মধ্যে মানুষের যাতায়াত প্রধানত একমুখী আকার নিয়েছে। পশ্চিমবাংলা— স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে সত্তরের মাঝ বরাবর ঘোষিত নীতি অনুসরণ করেই পূর্ব পাকিস্তান এবং পরে বাংলাদেশ থেকে আগত মানুষদের স্থান করে দিয়েছে। পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যার উপর এবং সাধারণভাবেই, বাংলা-আসাম তথা পূর্বাঞ্চলের অর্থনীতির উপর এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী আকার নিয়েছে। যাঁরা সেই সময়ের চালচিত্র কিছুটা মনে রেখেছেন বা পরে পড়েছেন তাঁরা জানবেন যে, সরকার তখন লক্ষ লক্ষ মানুষের আগমন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত; পুলিশ এবং সরকারি প্রশাসনে, বাস-ট্রাম কোম্পানিতে, মহাকরণের বিভিন্ন দপ্তরে ইত্যাদি জায়গায় অনেককে চাকরি দিয়েও কুল পাওয়া যাচ্ছে না। বহু মানুষের দারিদ্র্য এবং গৃহহীন অবস্থা, যে কোনও রাজ্যের পক্ষে এক স্পষ্ট মানবিক বিপর্যয়। কেন্দ্রীয় সরকার চেয়েছিল শরণার্থীরা দণ্ডকারণ্য ও আন্দামানে বসতি স্থাপন করুক । বেশ কিছু মানুষকে পাঠানো হয়েওছিল। তখনকার দণ্ডকারণ্যে যেমন মাওবাদী সমস্যা ছিল না, তখন ওই গভীর জঙ্গলে উন্নয়নের কোনো নামগন্ধও ছিল না। দোলায় শুইয়ে রাখা শিশুকে চিতাবাঘ নিয়ে গেছে এমন ঘটনাও ঘটেছে। সুতরাং নিছক মানবিক

কারণেও পশ্চিমবাংলার নেতারা চান নি শরণার্থীদের ঠাঁই হোক সেখানে। এছাড়া, রাজনৈতিক চাপান-উতোর যে ধরনেরই হয়ে থাকুক না কেন, মোট কথা হল, এত মানুষকে রাজ্যে ঠাঁই দিতে গেলে, আইনি বন্দোবস্ত করে দিতে গেলে, আইন-কানুনকে কিছুটা কোণঠাসা হতেই হয়। যতই হোক, আইন তো আর মানবিকতার চেয়ে বড় নয়। দ্বিতীয়ত, রাজনীতি স্বভাবতই ছিদ্রান্বেষী। পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলে যদি রাজনৈতিক ফায়দা লোটা যায়, তাহলে সেই সময়ের বাম চিন্তাবিদ মহল সে সুযোগ ছাড়ে কি করে!

পরবর্তীকালে নাকি অনেকে বলেছেন, জ্যোতি বসু মহাশয় উদ্বাস্তুদের নিয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না, এবং আহামরি কিছু করেও দিয়ে যান নি। এ অভিযোগের ভিত্তি বেশ দুর্বল। তবে, সত্যি সত্যি গরিব-দরদী সর্বহারার নেতা যাঁরা ছিলেন, তাঁদের নাম এখন কেউ মনে রাখে না, হয়ত দলিল দস্তাবেজ খুঁজে বের করতে হবে। তবুও উদ্বাস্তুদের নিয়ে আন্দোলনের পুরোধায় যে বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং কারণটিও খুব সহজ। রাজনৈতিক মস্তিষ্ক নিমেষেই বলবে যে যখন রাজ্যের পদাধিকারী নেতারা উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পাঠাতে মরিয়া, তখন তার বিরোধিতায় যে মাথা তুলে দাঁড়ালে— তার সুদূরপ্রসারী এবং সাময়িক প্রভাব যা-ই হোক না কেন, তা থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের আনুগত্য বহুদিনের জন্য নিশ্চিত করে ফেলা যাবে। কোনোদিন যদি এঁরা ভোটদানের যোগ্যতা অর্জন করেন এ দেশের নাগরিকত্ব পেয়ে (বিশেষত যাঁরা ১৯৭০-এর পরে এসেছেন), দণ্ডকারণ্যের পরিকল্পনা যাঁরা করেছিলেন, রাজ্যের সেই নেতাদের পরবর্তী প্রজন্মের ঠাঁই হবে রাজনৈতিক দণ্ডকারণ্যেই। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চিত্র দেখলে যে কেউই বলবেন যে, ক্ষমতায়নের এই পাশা খেলায় ডানপন্থীরা যেভাবে হেরেছেন, তাতে যুধিষ্ঠিরও লজ্জা পেতে পারেন!

যাই হোক, মূল বক্তব্য থেকে অনেকটা সরে না এসেও বলা চলে যে, তখনকার মতন যে সমঝোতা হয় পুনর্বাসন নিয়ে, তাতে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বাজার বা দোকানঘর তৈরি করে দেওয়ার প্রকল্প নেওয়া হয় অন্যতম আবশ্যিক প্রয়োজন হিসেবে। বিভিন্ন জায়গার হকার্স কর্নার বা বাস্তুহারা বাজার দিয়েই সম্ভবত শুরু কলকাতায়। গড়িয়াহাট, কালীঘাট, দেশপ্রিয় পার্ক, হাতিবাগান, শ্যামবাজারের রাস্তায় রাস্তায় খুচরো ব্যবসার প্রচলন।

অন্যান্য বহু আইনের মতন হকার আইনও আছে আমাদের দেশে। প্রায় একই রকম আইন বিদেশের জন্যেও প্রযোজ্য, কারণ, আইনের ধরনগুলো ইউরোপীয়। প্রধান নিয়মের মধ্যে লক্ষণীয় হল, হকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। অর্থাৎ সরকার নিজের হাতে ক্ষমতাটুকু রেখে দিয়েছে, যে কোনোদিন যদি মনে করে, এমন কোনো নিয়ম করবে যা হকারদের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে, তাহলে তা করা সম্ভব আইনগতভাবে। প্রধানত, এই কারণেই হকার ব্যবসার সঙ্গে অনিশ্চয়তার একটা গভীর যোগাযোগ রয়েছে। রাজনৈতিকভাবে করা যাবে কিনা, সরকার এমনটি করতে চাইবে কিনা, চাইলে তার ক্ষণস্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব কীরকম হতে পারে, এমন বহু বিচার্য বিষয় রয়েছে জনসমক্ষে। পদ্ধতি ঠিক হোক বা বেঠিক, হকার যে শহরাঞ্চলের মানুষের জীবনের প্রায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তা নির্ধারিত হয়েছে অনেকদিন আগেই। ফলে, শহরের প্রাণকেন্দ্র এবং উত্তর ও দক্ষিণের মূল সংযোগস্থলে মৌচাকের মতন স্থাপিত হয়েছে প্লাস্টিকে মোড়া হকার ব্যবসা। অপারেশন সান শাইনের আগে ও পরে। অন্যান্য ছোট শহরেও যে একই চিত্র তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কী পাওয়া যায় না হকারদের কাছে! আলপিন থেকে এলিফ্যান্ট, মানে হাতির মূর্তি, দেওয়ালে টাঙানোর ম্যুরাল ইত্যাদি। অন্যান্য জিনিস অর্থাৎ জুতো, জামা, শাড়ি, ব্যাগ, নীল-সাদা হাওয়াই চপ্পল, মোবাইলের খাপ, টেবিল কভার, বেডকভার, চীনেমাটির কাপ-ডিশ, নকল ও আসল দু-রকমই, পর্দার কাপড়, ক্যালকুলেটর, খেলনা এবং যাবতীয় নিলামবালা পণ্যসামগ্রী। দাম? দরাদরি সাপেক্ষ, যেহেতু এই ব্যবসার বিশেষ কোনো স্থায়ী খরচ নেই। অর্থাৎ ব্যবসা শুরু করার যে প্রাথমিক খরচ যা প্রতিটি নথিবদ্ধ দোকান বা ব্যবসার থাকতেই হবে সরকারি নীতি মেনে, ফলে মুনাফার কোনো নিম্নতম স্তর নেই। এক্ষেত্রে ঝোপ বুঝে কোপ মারা একটা চালু ব্যবস্থা— কারো কাছে এক টাকা মুনাফা আবার কারো কাছ থেকে একশো টাকা। এমনটা প্রায়ই হয়ে থাকে, বিশেষ করে আনাড়ি দাম-অনভিজ্ঞ পুরুষরা। বাড়ির গৃহিণীর ভূমিকা নিয়ে হকারদের কাছ থেকে বাজার-দোকান করতে যান। ফুটপাতে বসে বিক্রি করেন বলেই মনে করার কোনো কারণ নেই যে কারও চোখে এঁরা পড়ছেন না। পুলিশ আছে, সংঘবদ্ধ তোলা আদায়কারী আছে, রাজনৈতিক নেতার ভাগ আছে। সবাইকে খুশি করে তবেই তো মুনাফা! আর কিছু মুনাফা না থাকলে ব্যবসা করে লাভ কী?

হকার ব্যবসার সঙ্গে নিয়ম-নির্ধারক আর আইন রক্ষকদের

যোগাযোগ প্রশ্নাতীত। শোনা যায়, গড়িয়াহাটের সব কটি দোকান যে জেনারেটারগুলির সাহায্যে আলোকিত, সেগুলি নাকি ওই অঞ্চলের এক প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতার ভাড়া দেওয়া। সত্যের অপলাপ ঘটে থাকলে ক্ষমাপ্রার্থী, কিন্তু রাজনীতির দিশা পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে হকারদের এবং অটোচালকদের রাজনৈতিক আনুগত্য পাল্টানো নিশ্চয়ই শহরবাসীর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। এর প্রয়োজন তো তখনই ঘটে, যখন ক্ষমতায় যাঁরা আছেন তাঁদের দাক্ষিণ্য পাওয়ার প্রশ্নটিও জড়িয়ে থাকে ব্যবসার সঙ্গে। আর এই যুগে খালি হাতে কেউ কাউকে দাক্ষিণ্য বিতরণ করছে, এটা ভাবতে একটু অবাক লাগে না কি? চিন্তাবিদরা বলেন, হকার ব্যবসা নাকি ধনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ারই এক রূপ, যেখানে এই প্রান্তিক মানুষরা ধনতন্ত্রের ঠিক ভেতরেও নেই আবার বাইরেও নেই। এদের কথা নাকি স্বয়ং মার্ক্সও বলে যান নি। আমার ধারণা এর মূল কারণ হল ইউরোপে এত হকার তিনি কোনোদিন দেখেন নি যে!

কিন্তু মার্ক্স-বিশ্বাসীরা এদের নিয়ে কী করা যায় তা ভেবে উঠতে পারেন নি। ধনতন্ত্র এদের জন্ম দিয়েছে কিন্তু দেশ কি তাই বলে চোখ বুজে থাকবে? রাজনৈতিক নেতারা কি কোনো সুবিধাই পাবেন না এদের কাছ থেকে? অশিক্ষা, অদক্ষতা, নীতিহীনতায় পূর্ণ এবং দুর্নীতিগ্রস্ত একটি দেশে এমনটা আশা করা অন্যায়। নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে সরকার দিব্যি চোখ বুজে থাকতে পারে। কারণ হকারদের আয়ত্তের মধ্যে রেখে এবং তোলার ভাগ পেয়ে বড়-ছোট-মাঝারি নেতা যারপরনাই খুশি। আরও সুবিধে হচ্ছে, সংগঠিত ব্যবসা নেই, শিল্প নেই, ফলে তুলনামূলক অদক্ষ লোকের চাকরি নেই। তা সত্ত্বেও এই নিয়ে আন্দোলন একেবারে বন্ধ। ফুটপাতে বসার অধিকার দিয়েছে না সরকার?

অথচ, বেশ কয়েকটি আলোচনায় বহুবার উঠে এসেছে কয়েকটি সমাধান সূত্র। এক, শহরের উপর হকারদের নির্ভরশীলতা কমাতে গেলে আধা-শহরে সংগঠিত ব্যবসার দিকে নজর দিতে হবে প্রশাসন এবং অর্থলগ্নি সংস্থাগুলোকে। আধা-শহর বলছি, তার কারণ হল, বড় শহরে এসে ব্যবসা করার প্রয়াস এগুলো থেকেই সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয়ত, ছোট শহরে বা গ্রামে মানুষ একে অপরকে জানেন, ফলে লগ্নি করা টাকা মার যাওয়ার সম্ভাবনা কম; এমনকি তা ব্যাঙ্কের মতন সংস্থা দ্বারা লগ্নি করা হলেও। তৃতীয়ত, ছোট শহর স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বলেই বড় শহরের উপর চাপ বেশি পড়ে। ছোট শহর যদি সংগঠিত বিনিয়োগের মাধ্যমে বড় শহরের থেকে বেশি হারে বৃদ্ধি না করে (কিন্তু বহরে অতিরিক্ত না বেড়ে) তাহলে সেখান থেকে বাইরে ব্যবসা করতে যাওয়া আটকানো যায় না। এই বক্তব্যের ভিত্তি হল যে, বাংলার ছোট শহরেও প্রচুর লোক থাকেন, সেখানেও চাহিদা খুব কম নয়। এটাকে আমরা একেবারেই ব্যবহার করতে শিখিনি। তবে, বাংলার বড় শহরে শুধু অভ্যন্তরীণ মানুষ আসেন না, পাশের রাজ্যগুলো থেকেও এসে চলেছেন নিরন্তর।

সুতরাং, হোক না মেট্রোরেলের ঢোকার পথ প্রায় বন্ধ। মফস্বলের রেল স্টেশনের বাড়িটাও চোখে না পড়ুক হকারদের দৌরাত্ম্যে। রাস্তা ছোটো হয়ে যাক দু-ধারে হকার বসে থাকার কারণে। যতই বড় বড় কথা বলুক না কেন মধ্যবিত্ত রাস্তায় নেমে বিপ্লব করে না, কাগজে-কলমে । তাদের সুখ-সুবিধে ঠেসে ধরলে কে করবে আপত্তি? কে-ই বা শুনবে? ভোটবাক্সে যাতে এর প্রতিফলন না পড়ে তার ব্যবস্থাও করা থাকে অনেক আগে থেকেই। এর মধ্য দিয়েই কেন্দ্র আর রাজ্য সরকারের পট পরিবর্তন চলতে থাকে। তবে, ভারতে কেন্দ্রীয় আর রাজ্য রাজনীতি বিভিন্ন ধারাতে, এমনকি বিপরীত পথেও যে বইতে পারে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বহুদলীয় রাজনীতিতে বিকল্প পথের সন্ধান করা স্বাভাবিক ব্যাপার আর তা অর্থনৈতিক বিচার ও সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। তবে এই বিকল্প অবস্থানগুলো যদি মেরুকরণের শিকার হয়, তাহলে মানুষের বিস্তর অসুবিধে হওয়ার কথা। এর মন্দ দিকগুলো আমাদের অজানা নয়। এই প্রভূত রাজনৈতিক বৈপরীত্যের মধ্যেও যে ভারত অখণ্ড হয়ে টিকে থাকে, তার একটা কারণ সম্ভবত ক্রিকেট। দ্বিতীয়টি হল এই যে, সবাই কম-বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত। আর তৃতীয়টি হল, স্থান-কাল নির্বিশেষে গোটা দেশেই অসংগঠিত ব্যবসা আর বিধিবহির্ভূত ব্যবস্থার রমরমা। ভারতের মতো এত বিপুল বহরের অসংগঠিত ব্যবসা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। এই ক্ষেত্রে প্রাত্যহিক ব্যবসা যে কোনো ছোট দেশের জাতীয় আয়ের সমান হতে পারে। যে পরিমাণ মানুষ এই ধরনের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তা ইউরোপের লোকসংখ্যার সমান। পশ্চিমবঙ্গের বিষয়ে আগে যা বলা হয়েছে, তা এই বৃহত্তর ব্যবস্থার একটি অংশ মাত্র।

সুতরাং, এই ক্ষেত্রের থাকা, না-থাকা রাজনীতিতে ছাপ ফেলবেই। কেন্দ্রে বা রাজ্যে যারা ক্ষমতায় আসে, তাদের নজরে অসংগঠিত ক্ষেত্র দুটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্ক বলে ভাবলে ভুল হবে। এই ক্ষেত্র রাজনৈতিক দলের হিসেব-বহির্ভূত চাঁদার

জোগানদারও বটে। পার্টি তহবিলে চাঁদার জোগান সচল রাখতে গেলে অসংগঠিত ক্ষেত্র বজায় রেখে দেওয়া দলের রাজনৈতিক চাহিদা হতেই পারে। কিন্তু সরকারের সরাসরি এমনটি চাওয়ার কারণ কী? সরকার তো আর চাঁদা কিংবা 'তোলা'র সাহায্যে চলে না, চলে করদাতার টাকায়। সংগঠিত ক্ষেত্র যখন অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রম ব্যবহার করে এবং কর্মীকে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা না দিয়ে অন্যায্য মুনাফা করে, সরকার দেখেও দেখে না। এই বিষয়ে কোনো আইনি লড়াইতে সরকার জড়িয়ে পড়লে বেশিরভাগ সময়ে মামলা হেরে যায়। অসংগঠিত ক্ষেত্র বড় হতে থাকলে রাজস্ব আদায় হয় কি? রোজগার না হলে উন্নয়ন বাবদ খরচ কমতে থাকে, আর গদি হারানোর ভয় থাকে। কিন্তু তোলার টাকায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির ক্ষমতার বৃত্ত বড় হতে থাকলে সরকারের ক্ষমতায় টিকে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। ছোট পরিসরে এই 'ছোটোখাটো' দুর্নীতি আঞ্চলিক দলগুলোর মধ্যেই বেশি প্রচলিত।

অনেক বড় দুর্নীতি, যেমন ধরুন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক কেমন করে জেনে শুনে অপ্রচলিত সম্পদ (নন-পারফরমিং অ্যাসেট) সৃষ্টি করে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীকে ঋণ দিয়ে কিংবা খনিজ-দ্রব্য আহরণের লাইসেন্স কে পাবে বা বেসরকারি কোম্পানির বিশাল ঋণের দায় সরকার কেমন করে করদাতার টাকায় মিটিয়ে দেবে আর ব্যবসায়ীকে বিদেশে পালিয়ে যেতে দেবে অথবা কামান দাগতে গেলে কত রকমের দুর্নীতি করা সম্ভব; এগুলো সাধারণভাবে কেন্দ্রের হাতে থাকে। তবে সরকারের এই জাতীয় দাক্ষিণ্য তো আর বিনা খরচে পাওয়া যায় না, এর জন্য রাজনৈতিক দলের ভাঁড়ারে দান-ধ্যান করতে হয়। ফলে, বড় দুর্নীতি থেকে হওয়া রোজগারে সুসংহত জাতীয় দলের কোষাগার অনেক দিনের জন্যে সচল থাকলে অসংগঠিত ব্যবসার প্রতি অবহেলা করা যেতেই পারে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছতা আনার যে রাজনৈতিক প্রয়াস মাঝে মাঝে দেখা যায়, তাতে বড় ব্যবসার বিশেষ ক্ষতি নেই। কারণ, এই ধরনের অভিযান যখন হয়, তখন তাদের জানিয়ে শুনিয়ে করা হয়, যাতে সাবধান হওয়ার সুযোগ থাকে অথবা ব্যক্তিগত পরিধিতে খানিকটা অসুবিধে হলেও ব্যবসা ক্ষেত্রে নোট বাতিল বা জি-এস-টি ধরনের পলিসি বড় প্রতিষ্ঠানকে বিব্রত করতে পারে না। ফলে সরকারের ওপর রাগ করে এরা ভোট প্রচারের খরচ জোগানো বন্ধ করে দেবে এমন সম্ভাবনা কম। বাকি রইল গরিব ভোটব্যাঙ্ককে কীভাবে এই ধরনের পলিসির যাথার্থ্য বোঝানো যাবে, সেই কাজ। যেহেতু, পৃথিবী জুড়ে আর্থিক বৈষম্য নিয়ে প্রচুর বক্তব্য নতুন করে আলোড়ন ফেলছে, সুতরাং সরকারের নেওয়া নীতি গরিব-বড়লোকের বৈষম্য দূর করবে, এমনটা প্রচারিত হলে ভোটব্যাঙ্ক প্রভাবিত হতে বাধ্য। এই প্রয়াস সফল হলে, গরিব মানুষ খেতে না পেলেও হাসি-হাসি মুখে ঘুরবেন, কারণ বড়লোকের ক্ষতি হয়েছে। আর বড়লোকের ক্ষতি হবার ভয় থাকলে গরিব মানুষও কিঞ্চিৎ ভাগ পায়— যেমন নোট বাতিলের পরে জন-ধন যোজনায় বড়লোকের কালো টাকা কিছুটা হলেও জমা পড়েছে বলে অনেক মহল মনে করছে। এ এক ধরনের রোজগার পুনর্বণ্টন বৈকি, কিন্তু যেহেতু অসংগঠিত ক্ষেত্রের উৎপাদন বেড়ে এই রোজগার হয়নি, ফলে আঞ্চলিক তোলাবাজদের আয়ত্তের বাইরে রয়ে যাবে এটি।

এই ধরনের নীতি কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর রাজনৈতিক বিভেদের অন্যতম কারণ বলে মনে হয়। কেন্দ্রের স্বচ্ছতা নীতিতে যে ধরনের ব্যবসা সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তারা রাজ্যগুলোর আইনি রোজগার আর আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের বেআইনি রোজগারের চাবিকাঠি। এক ঢিলে দুই পাখি মারার এই পরিকল্পনা সফল হলে খানিকটা জোর করে হলেও কেন্দ্র আর রাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টি হতে বাধ্য। না হলে, ছোট-বড়র বিভেদ সরিয়ে রেখে যদি স্রেফ দুর্নীতির কথাই বলা যায়, তাহলে কে প্রথম হবেন আর কে দ্বিতীয় তা নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য কাজ। আর লিস্টে কার নাম নেই তা খুঁজতে সাবান কোম্পানির পুরনো বিজ্ঞাপনের সাহায্য নিতে হবে — 'সিরফ্ টুন্ডতে রহে জাওগে'।

দুর্নীতিগ্রস্ত ভারত, অসংগঠিত ব্যবসার ভারত, ক্রিকেট-মগ্ন ভারত এই কারণেই অখণ্ড থাকবে, তা যতই রাজনৈতিক টানাপোড়েন চলুক না কেন।

উমা

উৎস মানুষ-এর নতুন প্রকাশিতব্য বই

আহরণ

বিভিন্ন মনীষীর যুক্তিবাদ-নির্ভর যে সব লেখা পত্রিকার পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তারই নির্বাচিত কিছু লেখার সঙ্কলন। যে লেখা ভাবাবে, সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

পাহাড়-অভিযানের অসুস্থতা ও প্রাপ্তি

গৌতম মিস্ত্রী

কেন যেতে চাইবঙ্গ পাহাড়-পর্বতের নীচের দিককার ও মাঝারি উচ্চতার কিছু কিছু অংশে শহরের মানুষ গাঁটের কড়ি ফেলে পৌঁছে যায় খেয়াল-খুশি মতো। পাহাড়ের দেওয়াল কেটে, ডাইনামাইট দিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে, পাহাড়ি ঝর্ণার ওপরে সেতু বেঁধে নয়নাভিরাম সব জায়গাগুলিতে ক্যামেরা নিয়ে পৌঁছে যাবার সুবন্দোবস্ত করা আছে। কিন্তু সেইভাবে পাহাড়ে চড়ার একটাই সমস্যা। যে শব্দ ও দৃশ্যদূষণ এবং তার আনুষঙ্গিক বাতাবরণের বিষবাষ্প থেকে মুক্তি পাওয়ার আশে পাহাড়ে যাওয়া, বাসে-ট্রাকে-এরোপ্লেনে চেপে সেই দূষণ পাহাড়েও পৌঁছে যায়। নিভৃতে ধ্যানমগ্ন হওয়ার শিখরচূড়া, গিরি কন্দর, গুহা বা গাছতলা মেলে না। হয়ত দার্জিলিং-সিমলার ম্যালের বেঞ্চিতে বসে শহরে দুষ্প্রাপ্য শীতের পরশ নিচ্ছেন, পাশের বেঞ্চিতে গড়িয়াহাট ও বেহালার বাজারের বেনারসি শাড়ির দাম ও মানের আলোচনা চক্রের ভাষণ কানে প্রবেশ করছে। হয়ত স্থানীয় খাদ্য সংস্কৃতির নমুনা পরখ করতে ইচ্ছে করছে, কন্ডাক্টেড ট্যুর অপারেটর সমবেত আবদার মেনে আপনাকে আলু পোস্ত আর ডিমের ডালনাই কেবল খাইয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আপনার মন চাইছে একদম পাহাড়ের কোলে খাঁটি পাহাড়ের সুরে ও ছন্দে নেচে বেড়াতে, শহরের ভেজালের ভিড় আপনার শরীরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। গাড়ির রাস্তার শেষে পৌঁছে গিয়েও দেখলেন, আপনার যাবার কথা 'হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে!' সেই অন্য কোনোখানে গাড়ির চাকা পৌঁছয় না। নশ্বর জীবনের অনেক কিছু অধরা স্বপ্নের মতো দূরের অস্পষ্ট পাহাড়ের শিখরচূড়ার দিকে পেছন ফিরে সাঁঝবেলায় একটা সেলফি তুলে নিয়ে মনের সাধ মেটাতে হয়। সেই ছবিতে আপনার পেছনের পাহাড়টা কেবল আপনিই মনশ্চক্ষে দেখতে পান। অন্যেরা পায় না, কারণ পেছনের পাহাড়টা যে অনেক দূরে! ক্যামেরা আলোক-বিজ্ঞানের নিয়মে চলে, আমার আপনার মনের চাহিদার তোয়াক্কা করে না।

মনের সাধ মেটানোর অদম্য ইচ্ছেওয়ালা নাছোড়বান্দা কিছু মানুষের পাহাড়ে ভ্রমণ শুরু হয় অন্যভাবে। এই শ্রেণীর মানুষদের যাত্রা শুরু হয় সেখান থেকে, যেখানে মোটরগাড়ির রাস্তা শেষ হয়েছে, যেখানে প্রথম হোটেলটি সবে নির্মিত হচ্ছে। এই ভ্রমণপিপাসু মানুষগুলো ঐ অবধি এক দৌড়ে পৌঁছে তারপর ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বার করে, মুখে সানস্ক্রিন মেখে, পায়ে তার বেশভূষার মধ্যে সবথেকে দামি একজোড়া খানদানি স্নিকার পরে, পিঠে ঘনিষ্ঠতম সঙ্গী ব্যাক-প্যাক চাপিয়ে যাত্রা শুরু করে। আগামী দিনগুলোতে সে উপভোগ করবে শহুরে সভ্যতার অন্তরালের সোনালি মুহূর্তগুলো। দিনশেষে কোনো এক গহিন হিমালয়ের প্রান্তরের তাঁবুতে ভূমিশয্যা যে কোনো পাঁচতারা রিজর্টের চেয়েও তার কাছে দামি। মাঙ্কিক্যাপ-মাফলার পরিহিত দার্জিলিং-সিমলা-মানালি-লেহ-লাদাখ ভ্রমণ করে ও বিস্তর ক্যামেরার ক্লিকবাজি করে ঘরে ফিরে যাঁরা অনুভব করেন, ক্যামেরা একটি অতি বিশ্বাসঘাতক যন্ত্র, তাঁরা সবিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া করে দেখেন পাহাড়টা তবে কাছে থেকে এমন সুন্দরও লাগে! প্রতিটি ছবিই যেন ক্যালেন্ডারের পাতার পাতে দেওয়ার যোগ্য। তবে ছবি তো কেবলই ছবি। পটে আঁকা ছবিরও পেছনে যেমন গল্প থাকে, গহিন হিমালয়ের অন্দরমহলে অবহেলায় ক্যামেরার ক্লিক এমন আশ্চর্য সব মুহূর্ত বন্দি করে আনে, সেই ভ্রমণের গল্পের কাছে সব ছবিই জোলো হয়ে যায়। আমার সাধ্য কি শব্দে তার আভাস দেব! তার চেষ্টা না করে বরং আমরা ট্রেকিংয়ের স্বাস্থ্য নিয়ে দু-চার কথা আলোচনা করে নিই। পাহাড়ে বেড়াতে গেলে, তা সে মোটরে-এরোপ্লেনে চেপে বা পায়ে হেঁটেই হোক না কেন, কিছু বিশেষ শারীরিক সমস্যা হতে পারে। আবার পাহাড়ে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস থাকলে সমতলের মানুষজনদের কিছু দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক ও মানসিক সুবিধাও হয়ে থাকে। প্রথমে পাহাড়ের উচ্চতাজনিত বিশেষ শারীরিক সমস্যার কথা দিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক।

মাউন্টেন সিকনেসঙ্ক সমতলের মানুষ পাহাড়ে গেলে তাৎক্ষণিক কিছু শারীরিক সমস্যা হয়। এটাকে অ্যাকিউট মাউন্টেন সিকনেস বলে। এখানে 'তাৎক্ষণিক' বা 'অ্যাকিউট' কথাটা লক্ষণীয়। আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা না থাকলে আবার তাৎক্ষণিক বলে শব্দ অপচয় করা কেন? বেশিদিন ধরে অধিক উচ্চতায় (সমুদ্রতল থেকে ১০ হাজার ফুটের বেশি উচ্চতায়) থাকলে ফুসফুসের প্রধান রক্তনালীর চাপ বৃদ্ধি পায় ও হৃৎপিণ্ডের ডান দিকের প্রকোষ্ঠগুলো আয়তনে বাড়ে ও তার দেওয়ালগুলো মোটা হয়ে যায়। এইজন্য সিয়াচেনে সৈন্যদের একনাগাড়ে বেশিদিন রাখা হয় না। আমরা সেই আলোচনায় তত আগ্রহী হব না এই মুহূর্তে। আমরা শখের ভ্রমণার্থী। কষ্টেসৃষ্টে ছুটি জোগাড় করে বেড়াতে যাবার জন্য লক্ষীর ঘটে জমিয়ে রাখা পয়সাকড়ি কুড়িয়েবাড়িয়ে হাতেগোনা কয়েকদিনের জন্য পাহাড়ে যাই। তবুও অ্যাকিউট মাউন্টেন সিকনেসজনিত মাথাব্যথা নিয়েই আমাদের যত মাথাব্যথা। এটা অ্যাকিউট মাউন্টেন সিকনেসের একটা অন্যতম লক্ষণও বটে। সাধারণত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮০০০ থেকে ১০,০০০ ফুট ওপরের উচ্চতায় পৌঁছনো সমতলের মানুষদের আক্রান্ত করে।

অ্যাকিউট মাউন্টেন সিকনেসঙ্ক এটি দু ধরনের— মামুলি ও মারাত্মক। মামুলি সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানুষ মাথাব্যথায় ভোগেন। এছাড়া আছে খাবার অনিচ্ছা, বমি বমি ভাব আর অনিদ্রা। পৃথিবীর ধুলোমাটির নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে আমরা যত উপরপানে যেতে থাকব, বাতাসের প্রাণবায়ু বা অক্সিজেন তত কমতে থাকবে। এ ছাড়া উচ্চতায় বাতাসের চাপও কমে যায়। হিমালয়ের হাল্কা হাওয়ায় বাতাসে জলীয় বাষ্পের অনুপাত কমে যায়, বাতাস অপেক্ষাকৃত শুষ্ক হয়ে পড়ে। আর থাকে অতিবেগুনি (আলট্রা-ভায়োলেট) রশ্মির দাপট। অপরিচিত পরিমণ্ডলের প্রভাবে আমাদের শারীরিক কর্মকাণ্ড বিগড়ে গিয়ে ঘটে অ্যাকিউট মাউন্টেন সিকনেস, যেটা কিনা অল্পবিস্তর সবাইকেই বেকায়দায় ফেলে। তবে এই সমস্যাগুলো ক্ষণস্থায়ী, ধীরে ধীরে উচ্চতা অর্জন করলে, বেশি করে জল পান করলে এই সমস্যাগুলো এড়ানো যায় অথবা সমস্যা হলেও এক-দু দিনের মধ্যে নিজের থেকেই সেরে যায়। মাথাব্যথা অসহ্য হলে এক-দুবার প্যারাসিটামল ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে মাথাব্যথা আবার মারাত্মক 'হাই অল্টিচ্যুড সেরিব্রাল ইডিমা' নামে আর এক ভয়ঙ্কর রোগের প্রাথমিক লক্ষণও বটে। এ ব্যাপারে পরে আসছি। অল্পস্বল্প মাথাব্যথা ক্লান্তিহরা এক রাতের নিশ্ছিদ্র ঘুম (যাকে বিলিতি কায়দায় 'সাউন্ড স্লিপ' বলে) সারিয়ে দিতে পারে। এজন্য বিচার-বিবেচনা করে ছোট্ট একটি ঘুমের বড়ি রাতে শোবার আগে খাওয়া যেতে পারে। তবে ঐ যে বললাম, 'হাই অল্টিচ্যুড সেরিব্রাল ইডিমা' নেই, সেটা নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে। ভয়ঙ্কর সমস্যাগুলো শেষের দিকে বলাই ভালো, কারণ ওগুলো তত বেশি দেখা যায় না পাহাড়প্রেমীদের কাছে। খাবার অনিচ্ছার সঙ্গে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেয় পাহাড়ের শিবিরের অল্প পরিচিত ও আধসেদ্ধ খাবারদাবার। পাহাড়ের উচ্চতায় ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচেই জল স্ফুটনাঙ্কে পৌঁছে যায় বলে প্রেশার কুকার ছাড়া খাবারদাবার সেদ্ধ হয় না। রান্না করার জন্য চাল-ডাল-তেল-নুন, স্টোভ, কেরোসিন, হাঁড়ি-কড়াই-প্রেশার কুকার সবই তো নীচের বাজার থেকে বয়ে নিয়ে যেতে হয়। আজকাল অবশ্য নেপালের এভারেস্ট বেস ক্যাম্প অবধি মাল্টি-কুইজিনওয়ালা হাই প্রোফাইল হোটেল গজিয়ে গেছে। ১৭-১৮ হাজার ফুট উচ্চতার সেই সব বিলাসবহুল হোটেলের চানঘরে জলের কলের চাবি খুললেই ২৪ ঘণ্টা গরম জল মেলে। আমরা শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত ডলার-ইউরো পূজিত ঐ রাস্তার কথাও বলব না। ভেতো বাঙালির সাধ্যের মধ্যে এখনও পড়ে-থাকা পাহাড়ি পথের সমস্যা ও তার সমাধানের রাস্তা খুঁজব, যে পথের রোমাঞ্চ ডলার-ইউরোর কাছে বিকিয়ে যায় নি।

যা বলছিলাম, পদব্রজে হিমালয়-ভ্রমণের আগে দলের মধ্যে কার কী খাবার পছন্দ সেটা আগে থেকে ভেবে ও পরিকল্পনা করে নিলে ভাল। বাড়ির অভ্যাস যাই থাকুক না কেন, পাহাড়ের পথে নামার আগে সকালবেলায় পেট ভরে খেয়ে নিতে হয়। কারণ পথিমধ্যে রান্নার উপায় থাকে না। আমাদের বঙ্গদেশের পাহাড়ে হেঁটে বেড়ানোর পাগলপানা লোকজনদের মধ্যে সকালে থালাভরা গরম ফেনা ভাত আলুসিদ্ধ এবং /অথবা ডিমসিদ্ধ দিয়ে (ঘি অবশ্যই থাকবে) চটকে মেখে (চামচ দিয়ে এই অমৃত ভক্ষণ বেদস্তুর) খেয়ে নেওয়া জনপ্রিয়। বাঙালি ট্রেকারদের বৃত্তে এই অমৃতের নাম 'রাইস পরিজ'। এই মহার্ঘ 'ডিশের' সঙ্গে গোলমরিচের গুঁড়ো, কাঁচালঙ্কা ও পেঁয়াজ থাকলে আগে থেকে খাওয়া শুরু না করলে ঠকতে হতে পারে। কারণ ভাতে কম পড়তেই পারে। সকালবেলায় পেট ভরে খাবার সুযোগ না থাকলে সঙ্গে থাকুক বাদাম, ছোলা, আমসত্ত্ব, চকলেট, কাঁচা চিঁড়ে, ছাতু ইত্যাদি। খিদে পেটে বেশিদূর হাঁটা যায় না। ট্রেকিংয়ের

আবশ্যিক স্থানীয় পাহাড়ের মালবাহকরা সাধারণত ডাল-ভাতেই আনন্দে পেট ভরান। সবাইকে নিজ নিজ খাবারের পছন্দ আগের থেকে বুঝে নিয়ে সেই মতো রেশন সংগ্রহ থেকে প্রতিদিনের খাবারের পরিকল্পনা করে নিতে হয়। কারও হয়ত লুচি-পুরি বা হালুয়া খেতে ইচ্ছে করবে, কেউ বা ফ্রায়েড রাইস খেতে চাইবে। পিঠে দশ-বারো কিলো ব্যাগ নিয়ে পাহাড়ে হাঁটা বেশ খাটুনির। খাবারে আপস হলে বেশিদিন টানা যায় না। অভিজ্ঞ দলনেতা পাহাড়ে খাবারের সময় কে-কতটা খাচ্ছে বিশেষ নজর রাখেন। কম খাওয়া অসুস্থতার একটা প্রাথমিক লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়। যা খাবার পাওয়া যাচ্ছে সেটাই নাক টিপে না খেতে চাইলে অগ্রিম খাবার পরিকল্পনা করে নিতে হয়। হিসেবি খাবার ম্যানেজমেন্ট সফল অভিযানের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যিনি এই পৈটিক কর্মকাণ্ডের কাণ্ডারি, মানে এই কাজের দায়িত্বে থাকেন যিনি তার কেতাবি নাম 'কোয়ার্টার মাস্টার'।

আট-দশ হাজার ফুট উচ্চতার ওপরে সূর্যালোকে অতিবেগুনি রশ্মির পরিমাণ বেশি। রোদ সরাসরি গায়ে না পড়লেও বা মাথার ওপরে ছাতা বা ছাদ থাকলে চারপাশের বিচ্ছুরিত ও প্রতিফলিত অতিবেগুনি রশ্মি শরীরে পড়েই। চারপাশে বা পায়ের তলায় বরফ থাকলে প্রতিফলিত অতিবেগুনি রশ্মিও বিশেষ চিন্তার কারণ হয়। বেগে হাওয়া না বইলে বা বৃষ্টি-তুষারপাত না হলে পাহাড়ে হাঁটার সময় বেশ গরমই লাগে। কিন্তু কায়দা দেখাতে গিয়ে হাফ-হাতা টি-শার্ট পরে হাঁটলে সান-বার্ন বা চামড়া পুড়ে যাওয়া ঠেকায় কার সাধ্য। সানস্ক্রিন কিছুক্ষণের মধ্যে ঘামে ধুয়ে সাফ হয়ে যাবে। পুরো হাতা জামা এবং অতিবেগুনি রশ্মি নিরোধক ক্ষমতাযুক্ত ও চোখের পাশের দিকে ঠুলি লাগানো রোদচশমা ছাড়া পাহাড়ে হাঁটা বিপজ্জনক। অতিবেগুনি রশ্মি চোখের সামনের সাদা অংশ (কঞ্জাইটিভা) ও পেছনের সংবেদনশীল পর্দায় (রেটিনা) প্রদাহ সৃষ্টি করে ও সাময়িকভাবে অন্ধ করে দিতে পারে। পাহাড়ের বেকায়দা জায়গায় হঠাৎ অন্ধ হয়ে গেলে কী হতে পারে তা আমরা ইদানীংকালের 'এভারেস্ট' নামে এক হলিউডের সিনেমায় দেখে ও গল্পলেখকের সত্যকাহিনী অবলম্বনে লেখা বই পড়ে জেনে নিয়েছি। সেই গল্পে নায়কের চোখে কন্টাক্ট লেন্স ছিল। **কন্টাক্ট লেন্স পরে বরফের দেশে ভ্রমণ নিষেধ। ঠাণ্ডায় কন্টাক্ট লেন্সের প্রতিসরণাঙ্ক বদলে যায়, দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে যায়**। অর্থাৎ দার্জিলিং-সিমলা-মানালির চেয়ে উঁচুতে গেলে কন্টাক্ট লেন্স পাল্টে নাকের ডগায় লটকে থাকা চশমা সঙ্গে নিতে হবে। ভালো মানের রোদচশমা লাগবে পাহাড়ে হাঁটতে গেলে, বিশেষ করে যদি বরফের দেশে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। জামা প্যান্ট পুরোনো, তালি মারা হলে কোনো ক্ষতি নেই, কেবল চশমা ও জুতোতে আপস করা চলবে না।

এবারে দুটো সাংঘাতিক সমস্যার কথা উল্লেখ করব, যেগুলো হলে মৃত্যু অবধি হতে পারে। এগুলো হল ফুসফুস ও মস্তিষ্কে জল (আসলে রক্তরস) জমে যাওয়ার সমস্যা। প্রথমটা হাই-অল্টিচ্যুড পালমোনারি ইডিমা বা সংক্ষেপে 'হ্যাপো' আর দ্বিতীয়টা হাই-অল্টিচ্যুড সেরিব্রাল ইডিমা বা সংক্ষেপে 'হ্যাকো'। অক্সিজেন কমে গেলে আর বাতাসের চাপ কমে গেলে কেন ঐ অঙ্গগুলিতে জল জমে যায় সেটার সঠিক কারণ জানা যায় নি। তবে এই রোগ হলে কী হয়, এই রোগের লক্ষণই বা কী, আর তার চিকিৎসাই বা কী সে সম্বন্ধে স্পষ্ট করে অনেক কিছু জানা আছে।

সমতল থেকে খুব তাড়াতাড়ি দশ হাজার ফুট বা তার অধিক উচ্চতায় পৌঁছে গেলে, মানে উচ্চতাকে সইয়ে সইয়ে অর্থাৎ অ্যাক্লিম্যাটাইজ করে পাহাড়ে না চড়লে কালেভদ্রে পর্বতাভিযাত্রীকে আক্রান্ত করতে পারে হাই-অল্টিচ্যুড পালমোনারি ইডিমা। 'হ্যাপো' রোগে ফুসফুসের হাওয়া ভরা ছোট ছোট বেলুনের মতো অংশগুলির (এলভিওলাস) চারপাশের দেওয়ালের (ইন্টারস্টিসিয়াল টিস্যু) কোষে রক্তরস জমে ফুসফুসকে অনমনীয় করে তোলে। ফলে ফুসফুসকে ফুলিয়ে শ্বাস নেওয়ার জন্য বেশি শক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এতে শ্বাসকষ্ট হবে, এটা অনুমেয়। তবে পাহাড়ে হাঁটাহাঁটি করলে শ্বাসকষ্ট কারই না হয়! হ্যাপোর শ্বাসকষ্ট বোঝা যাবে এর মাত্রায়— অল্প হাঁটাহাঁটি করলেই প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হবে, যেটা সঙ্গীসাথীদের চেয়ে চোখে পড়ার মতো বেশি। শুয়ে পড়লে শ্বাসকষ্ট কমে যাওয়ার বদলে বেশি হবে। মাঝরাতে শ্বাসকষ্টের জন্য উঠে বসে পড়লে কষ্ট কমবে। ঠাণ্ডা লাগার কোনো ঘটনা ছাড়াই রাতে শুয়ে থাকা অবস্থায় বেমক্কা কাশি হবে। এই অবস্থায় এই রোগের সম্ভাবনা বুঝতে পারা খুব প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা নির্ণীত না হলে পরের দিকে কাশির সঙ্গে রক্ত বেরোতে পারে। এই অবস্থায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত সমতলে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন প্রাণ বাঁচানোর জন্য। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে অক্সিজেন এর একমাত্র ওষুধ। যাঁরা লেহ্ বেড়াতে গেছেন, ওখানকার হোটেল, রেস্টুরেন্ট, অফিস-কাছারিতে বড় বড় অক্সিজেন সিলিন্ডার দেখে

থাকবেন। কেদার-বদ্রীর যাত্রাপথেও ছোট ছোট অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনতে ও ভাড়া পাওয়া যায়। **ডায়ামক্স নামে একটি গ্লকোমা (চোখের চাপ বৃদ্ধির রোগ) রোগের ওষুধ অনেকে অধিক উচ্চতায় যাবার আগে থেকেই খেতে শুরু করে দেন 'হ্যাপো' আর 'হ্যাকো' প্রতিরোধের জন্য। এই প্রতিরোধমূলক চিকিৎসায় ডায়ামক্সের সাফল্যের কোনও প্রমাণ নেই, নেই কোনও বিজ্ঞানসম্মত সম্মতি**। সঠিক অ্যাক্লিম্যাটাইজেশন আর যথেষ্ট জল পান করা হল 'হ্যাপো' আর 'হ্যাকো' প্রতিরোধের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায়।

হাই-অল্টিচ্যুড সেরিব্রাল ইডিমা সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল এক পর্বতাভিযানে, আজ থেকে ২৭ বছর আগে। কালিন্দী অভিযানের একমাত্র মেডিকেল অফিসার হিসেবে সেটা আমার হিমালয়ের অন্দরমহলে প্রথম প্রবেশ। গঙ্গোত্রী হিমবাহের স্নাউট 'গোমুখ' থেকে একদিন চলে পৌঁছে গিয়েছিলাম চৌদ্দ হাজার ফুট উচ্চতার নন্দনবনে। নাম বন হলেও ওখানে অবশ্য কোনও বনজঙ্গল নেই, বড় মাপের একটা ময়দান। আবহাওয়া প্রচণ্ড প্রতিকূল। চারদিকে ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। তুষারপাত শুরু হয়ে গিয়েছিল ওখানে পৌঁছনোর ঠিক পরেই। তারপরের তিন দিনের ঘটনা আমার স্মৃতি থেকে মুছে গেছে। পরে সহযাত্রীদের কাছ থেকে শুনে আমার রোগ নির্ণয়ে অসুবিধে হয়নি। আমি নিজেই হাই-অল্টিচ্যুড সেরিব্রাল ইডিমা বা 'হ্যাকো'তে আক্রান্ত হয়েছিলাম। আমাদের মস্তিষ্ক শক্ত মাথার খুলির (করোটি) মধ্যে সুরক্ষিত থাকে যাতে ছোটখাটো ঘাত-প্রতিঘাত তার ক্ষতি করতে না পারে। মাথার খুলির এই শক্ত বর্মটাই বড় অসুবিধা করে দেয় যখন জল (আসলে মস্তিষ্কের রক্তরস ও সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুয়িড) মস্তিষ্কের কোষের মধ্যে জমতে শুরু করে, যেমন করে হাই-অল্টিচ্যুড পালমোনারি ইডিমায় ফুসফুসের মধ্যে রক্তরস জমে। মাথার খুলির শক্ত আবরণের মাঝে আটকে থাকা মস্তিষ্কে জমতে থাকা রক্তরস মস্তিষ্কের চাপ বাড়াতে থাকে। এই ব্যাপারটা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের রোগ বা 'হিমোরেজিক সেরিব্রাল স্ট্রোকের' সঙ্গে তুলনীয়। এই দুই অবস্থায়ই মস্তিষ্কের চাপ বৃদ্ধির কারণে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। প্রথমে মাথাধরা দিয়ে শুরু হয়, যেটা মামুলি বলে প্রথমদিকে ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক। সমস্যাটা উপযুক্ত গুরুত্ব না পেলে ও প্রতিকার না হলে আক্রান্ত ব্যক্তি ক্রমে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ও তার চিন্তাশক্তি লোপ পায়। এই অবস্থায় তড়িঘড়ি করে নীচে অবতরণ এর একমাত্র চিকিৎসা। এই অবস্থায় আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে নীচে নামা তো দূরের কথা, অবলম্বন ছাড়া সোজা হয়ে দাঁড়ানো বা হাঁটাও দুষ্কর হয়ে পড়ে। খাবার খাওয়া, জলপান ইত্যাদির তাগিদ বা ক্ষমতা থাকে না। মাথাব্যথা (অনুভূতির রকমভেদে মাথাধরা) মাত্রাতিরিক্ত হলে, প্যারাসিটামলে মাথাব্যথা না কমলে অথবা অল্প সময়ের জন্য মাথাব্যথা কমে ক্ষণিক পরে আবার শুরু হলে 'হ্যাকো' হল কিনা ভাবা দরকার। মাথাব্যথার সঙ্গে বমি বা বমির ভাব হলে সন্দেহ গুরুতর ভাবতে হবে। নন্দনবনে অন্য কোনও ডাক্তার ছিল না। দলনেতার এটা বুঝে উঠতেই তিনদিন লেগে গিয়েছিল যে, আমার হ্যাকো হয়েছে। তিনদিন পরে যখন জ্ঞান ফিরল তখন আমি এক পোর্টারের পিঠে নন্দনবনের অনেকটা নীচে। আমাকে বালির বস্তার মতো বেঁধে পালা করে দুইজন পোর্টার পিঠে করে নীচে নামছিলেন। নন্দনবন থেকে তিন হাজার ফুট নীচে গোমুখে নামার পরই আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলাম। পরদিনই আবার নন্দনবনে গিয়ে অভিযানের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে যোগ দিলাম। তারপর নন্দনবনের ১৪ হাজার ফুট থেকে কালিন্দী পাসের সাড়ে উনিশ হাজার ফুট উচ্চতায় উঠতে আর কোনও শারীরিক সমস্যা হয়নি। এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে প্রচুর স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন (ডেক্সামিথাজোন) মজুত থাকে। শোনা যায়, এভারেস্টের পথে হ্যাকো হলে বা হ্যাকোর সম্ভাবনা দেখলে ওখানকার মেডিকেল অফিসার মুড়ি-মুড়কির মতো স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন ঠুকে দেন। স্টেরয়েড সাময়িকভাবে মাথার খুলির মধ্যেকার চাপ কমায় বলে দু দশক আগে এই ওষুধটা সেরিব্রাল স্ট্রোকের রোগে মস্তিষ্কের চাপ কমানোর জন্য ব্যবহার হত। এভারেস্ট আরোহণের মতো বড়সড় প্রাতিষ্ঠানিক অভিযানের বাইরে গড়পড়তা ট্রেকারদের কারও হ্যাকো হলে স্টেরয়েড ব্যবহারের বদলে সত্বর নীচে নেমে আসাই কাজের বলে মনে হয়। **দু-চার হাজার ফুট নীচে নেমে গেলেই ম্যাজিকের মতো হ্যাকো সেরে যায়।**

পাহাড়ের সঙ্গে মাখামাখির প্রথম দিকে, ১৯৯২ সালে দার্জিলিঙের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে পর্বতাভিযান শিক্ষার জন্য সিকিমের সাড়ে চোদ্দ হাজার উচ্চতায় চৌরিথাং হিমবাহের এক শিবিরে দু সপ্তাহ থাকতে হয়েছিল। নিকটবর্তী গাড়ির রাস্তা ইউকসাম থেকে তিনদিন হেঁটেই সেখানে পৌঁছে যাওয়া যায়। মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে প্রথমদিকের প্রশিক্ষণের নির্ঘণ্টে তেমনটাই চল ছিল। তাতে বেশ কিছু শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ত। গত শতাব্দীর ৯০-এর

দশক থেকে তিনদিনের ঐ সফরকে পাঁচদিনে সম্পন্ন করার বিধি চালু করে অ্যাকিউট মাউন্টেন সিকনেস প্রায় পুরোটাই এড়ানো গেছে। প্রতিদিনের যাত্রাপথকে ভেঙে ছোট করা হয়নি। 'উচ্চতায় ঘোরাঘুরি করে নীচের শিবিরে রাত কাটাও' এই কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। আমাদের সঙ্গে দিন পনেরোর খাবারদাবার রেশন ইত্যাদির লটবহর ছিল। একটা শিবিরে পৌঁছে তার পরদিন ওপরের শিবিরে ঐ বাড়তি বোঝাগুলি রেখে রাতের আঁধারের আগেই নীচের শিবিরে নেমে আসতে হত ঘুমোনোর জন্য। পরদিন নিজের পিঠের ব্যাগ নিয়ে ওপরের শিবিরে থাকতে যেতাম। এইভাবে মাল ফেরি করতে করতে তিনদিনের পথ পাঁচদিনে যাওয়া হত। এতে ইনস্টিটিউটের মালবাহকের কিছু খরচ বেঁচে যেত ঠিকই, তাতে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যও সুরক্ষিত থাকত। ট্রেকিংয়ের যাত্রাপথের পরিকল্পনার সময়ে, বিশেষ করে ওপরের দিকে যাওয়ার সময়ে শিবিরের স্থানগুলি ও প্রতি দেড়-দু হাজার ফুট উচ্চতায় দুবার থাকার কথা মাথায় রাখা উচিত। দ্বিতীয় দিনে ওপরের শিবিরের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করে আসতে পারলে ভাল। এই প্রক্রিয়ায় অল্প মাত্রার অক্সিজেন শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপে অভ্যস্ত হবার সুযোগ পায়। প্রথমের দিকে এভারেস্টের চূড়ায় অক্সিজেন না নিয়ে যাওয়ার কথা কেউ কল্পনা করত না। পরের দিকে এই কৌশলে অক্সিজেন ছাড়াই এভারেস্টের চূড়ায় চড়া সম্ভব হয়ে গেল।

পর্যাপ্ত জলপান মাউন্টেন সিকনেস ঠেকাতে পারে। ঠাণ্ডার কারণে একদিকে যেমন পাহাড়ে জলতেষ্টা কম পায়, অন্যদিকে কনকনে ঠাণ্ডা পাহাড়ি নদী বা ঝর্ণার জল বেশি পান করাও কষ্টকর। পাহাড়ের হাওয়া বেশ শুকনো বলে ও হাঁটার সময় ঘন ঘন শ্বাস নেওয়ার সময়ে প্রশ্বাসের সঙ্গে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে জল বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যায়। তৃষ্ণা অনুভূতির ওপরে জলপানের পরিমাণকে ছেড়ে দিলে শরীরে প্রয়োজনীয় জলের অভাব ঘটে। প্রস্রাবের পরিমাণ কমে গেলে প্রয়োজনের তুলনায় কম জল পান করা হচ্ছে বোঝা যাবে। সাধারণত, তেষ্টা না পেলেও কমপক্ষে দৈনিক চার-পাঁচ লিটার জল পান করা একটা অভ্যাসে পরিণত করে নিতে হয়। পত্রপত্রিকা খুঁটিয়ে পড়েন এমন পাঠক বলতেই পারেন, পানের যোগ্য জল কোথায় পাওয়া যাবে? **স্থির কোনও জলাশয়ের জল নয়, বহমান পাহাড়ি নদী বা ঝর্ণার জল নির্দ্বিধায় পান করা যেতে পারে।** জনবসতিহীন পাহাড়ের এই সব উচ্চতায় জল দূষিত করার প্রাণীরা বিরাজ করে না। হিমবাহ গলা ঠাণ্ডা জলে রোগজীবাণুরাও বাসা বাঁধতে পারে

না। ভারতের উত্তর-পূর্বে সিকিম বলে এক অঙ্গরাজ্য আছে। সেই রাজ্যের উত্তরপ্রান্তে লাচেন আর লাচুন বলে দুটি ছোট্ট জনপদ আছে যেখানে ব্রিটিশ পরাধীন ভারতবর্ষেও আঞ্চলিক স্বশাসন ছিল। এখনও চালু সেই ব্যবস্থা বৃহত্তর ভারতের আইন-কানুনের থেকে স্বতন্ত্র ও শক্তিধর। সেই গণতান্ত্রিক স্বশাসনের ঐতিহ্য আবার ভারতের গণতন্ত্রের চেয়েও পুরনো। সেখানে কানুন মতে ঐ দুই জনপদে বোতলবন্দি জল বিক্রি ও ব্যবহারে পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড একদম নিশ্চিত। এই বছরেই (২০১৭) একটা তথ্য জেনে এলাম, এই ধরনের স্থানীয় নিয়মকানুন না মানার সাজা দেশের অন্যান্য সুসভ্য জায়গাগুলোর মতো দীর্ঘসূত্রতার দোষে দুষ্ট নয়। সেখানে স্থানীয় নিয়ম প্রায় ১০০ শতাংশ প্রয়োগ হয়ে থাকে। কোনও আবেদন চলে না সেই আঞ্চলিক নিয়ম ভাঙার দণ্ডের বিরুদ্ধে।

জনপদের বাজার-হোটেল-রেস্তোরাঁর সামনে টাঙানো বড় বড় বিজ্ঞাপন ভিন রাজ্যের ভ্রমণার্থীদের সেটা জানিয়ে দেয়। এই সব জায়গাগুলিতে পানীয় জলের সরবরাহ আসে পাহাড়ের ওপরের কোনও ঝর্ণা বা জলাশয় থেকে। বাণিজ্যিক সংস্থার বোতলজাত জল ছাড়াই সেখানকার মানুষ সুস্থ থাকেন। 'জিওলিনের ফোঁটা' না মেশানো সেই পাহাড়ি ঝর্ণার জল পান করে ভিন রাজ্যের ভ্রমণার্থীরাও অসুস্থ হয়ে পড়েন না। আমরা কর্পোরেট কালচারে অভ্যস্ত শহুরে মানুষ। কর্পোরেট-থাবা অগ্রাহ্য করে এমন জনপদের এক নমুনা পেয়ে গেলাম হিমালয়ের এক প্রত্যন্ত প্রদেশে। শহরের কালচারে অভ্যস্ত আমি একটা পলিথিনের ঠোঙা ডাস্টবিনে ফেলতে গিয়েছিলাম। বছর দশেকের এক স্কুলের ছাত্রী উল্টোদিক দিয়ে ফিরছিল। ছাত্রীটি সপ্রতিভভাবে বলল ও জঞ্জাল তোমরা নিজেদের ব্যাগে করে বাড়ি নিয়ে যাও। পরিমণ্ডল দূষিত করে না রাখলে বোতলবন্দি জলের প্রয়োজনই বা কি! হোটেলে কাঁচের বোতলে পাহাড়ি ঝর্ণার জল পানের জন্য পরিবেশন করে। উন্নত ইউরোপীয় ইউনিয়নের এক দেশী সংস্করণ নিজেদের দেশে দেখে ধন্য হয়েছিলাম। বেড়াতে গেলে বোতলবন্দি জল কিনে পান করায় অভ্যস্ত এমন যাঁরা প্রথমবার ট্রেকিংয়ে যান, তাঁদের অনেকেই ক্লোরিনের বড়ি, 'জিওলিন' ইত্যাদি পানীয় জল শোধন করার নানান বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে যান। এটা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় লোকালয়ের ওপরের পাহাড়ি পথে। হিমালয়ের পাহাড়ি ঝর্ণার জল একেবারে নির্ভেজাল বিশুদ্ধ ও **আসলি মিনারেল ওয়াটার**। সেটা কেবল নিরাপদই নয়, প্রচুর স্বাস্থ্যকর খনিজ পদার্থে ভরপুর। কেবল কোনও কোনও ঝর্ণার জলে ম্যাগনেসিয়াম থাকলে একটু আধটু 'হিল ডায়েরিয়া' অর্থাৎ বারেবারে পাতলা পায়খানা হয়। এটা রোগজীবাণুর সংক্রমণ নয়, অ্যান্টিবায়োটিক লাগে না। দু-একটা 'লোপেরামাইড' বা 'আইমোডিয়াম' খেলেই চলে। মনে রাখতে হবে, পাহাড়ে সমতলের চেয়ে প্রায় চার গুণ পানীয় জলের প্রয়োজন হয়। তেষ্টা না থাকলে সচেতনভাবে জল, চা, স্যুপ বা গরম পানীয়ের মাধ্যমে সেটা পান করা চাই। তাঁবুর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া অসংখ্য ঝর্ণা থেকে অনায়াসেই সেটা সংগ্রহ করে বোতলে ভরে সঙ্গে রাখতে হয়। পোড়-খাওয়া পর্বত-অভিযাত্রীরা গল্পগুজব করার ফাঁকে টুকটুক করে জল পান করতে থাকেন। ঠাণ্ডা জল পান করা না গেলে বড় পাত্রে জল গরম করে তাতে কিঞ্চিৎ চায়ের পাতা ঢেলে দিলেই চলে। পাহাড়ে রঙবেরঙের ফল, বেরি, শাক ও মাশরুম পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে অক্ষত ও চটকদার ফল মুখে না দেওয়াই ভাল। মনে রাখা দরকার, বিষফল পাখিতে ঠোকরায় না। স্থানীয় সঙ্গীসাথী বা মালবাহকদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে তবেই পাহাড়ের জঙ্গলের ফল ইত্যাদি খাওয়া যেতে পারে।

সব ট্রেকিং রুটেই নিয়মকানুন মনে করিয়ে দেবার বিজ্ঞপ্তি থাকে। যেমন চলার পথে চকোলেট-লজেন্সের প্যাকেট, আধরান্না মাছ-মাংসের খালি টিনের কৌটা, সিগারেট-গুটকার খোলস, আলু-পেঁয়াজের খোসা ইত্যাদি ফেরার পথে বয়ে নিয়ে এসে জনপদের পুর নিগমের নির্দিষ্ট ভ্যাটে ফেলতে হয়। জঙ্গল-সুরক্ষা ছাড়াও জঙ্গলে আগুন লেগে যাওয়া ঠেকাতে আমোদ ফূর্তির জন্য বা ঠাণ্ডায় আগুন পোহানোর জন্য 'ক্যাম্প ফায়ারের' চল উঠে গেছে। পাহাড়ি মানুষগুলো শহরের চেয়ে এই একটা ব্যাপারে সুসভ্য। পাহাড়ের ঢালের সীমিত বাসস্থানের ও সম্পদের ধ্বংস ওরা ঠেকিয়ে রাখে নিজেদের স্বার্থে।

অভিযান সাঙ্গ হলেও থেকে যায় যে প্রাপ্তিগুচ্ছ শহরের মেকি মুখোশের পেছনে কলুষমুক্ত প্রকৃতির এক অমোঘ আকর্ষণ থাকে, যেটার স্বাদ একবার পেলে অভিযাত্রীরা পদব্রজে পাহাড়ের অন্দরমহলে আবার পৌঁছে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে থাকে একটা অভিযান থেকে ফেরার পথেই। দুর্গম পথের কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নিতে তৈরি হয়। কেবল চোখের ও মনের আরামের সঙ্গে সঙ্গে কিছু জাগতিক দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারযোগ্য প্রাপ্তিও মেলে বটে। আমি কিন্তু পেশা হিসাবে পাহাড়ে ভ্রমণ সংক্রান্ত ব্যবসার প্রসার বা নয়নাভিরাম দৃশ্যপটের ছবি বা ভ্রমণ আলেখ্যের বই বিক্রির কথা বলছি না। পদব্রজে পাহাড়ের অন্দরমহলে ভ্রমণের জন্য অমূল্য শারীরিক সুস্থতা এক চরম প্রাপ্তি। আপন শরীর ট্রেকিংয়ের উপযুক্ত রাখার জন্য শক্তিশালী প্রেরণা কাজ করে যায় জীবনভর। পাহাড়ের উচ্চতায় কম অক্সিজেনের আবহাওয়ায় দৈনিক দশ-বারো কিলোমিটার বা একনাগাড়ে সাত-আট ঘণ্টা হাঁটার জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক প্রস্তুতি হিসাবে সারা বছর অ্যারোবিক ও অন্যান্য ব্যায়ামের তাগিদ অন্য যে কোনো প্রেরণার চেয়ে বেশি কার্যকর। পাহাড়ের সৌন্দর্যের নেশা যাবতীয় অস্বাস্থ্যকর নেশা দূরে রাখে। যদিও ট্রেকারদের মধ্যে পাহাড়ে পথ চলার সময়ে কেউ কেউ মাঝে মধ্যে ধূমপান করেন, মদ্যপায়ীরাও ঐ নেশা থেকে দূরে থাকেন না। এইসব নেশার কুফল সমতলে যেটুকু, পাহাড়ে সেটার ব্যাপ্তি অনেক। বেকায়দায় পড়লে সমস্যা থেকে উতরে দেবার উপায় ক্ষীণ। ঠাণ্ডায় শরীর গরম করার টোটকা হিসাবে যদি কেউ মদ পান করেন তবে সাময়িক ঠাণ্ডা কাটে ঠিকই, তবে সেটা চামড়ার নীচের রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধির কারণে। এতে শরীরের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে বড় সমস্যা হতে পারে। পাহাড়ে এমনিতেই অক্সিজেন কম, ধূমপান ফুসফুসের হাওয়া বহনকারী নালীগুলো সরু করে দিয়ে শ্বাসকষ্ট বাড়ায়। অন্যদিকে, ফটোগ্রাফি ও ভ্রমণকাহিনী লেখার শখ গড়ে ওঠে। হতাশাগ্রস্ত মানুষ মানসিক অবসাদ কমানোর ওষুধ ছাড়াই দিনযাপনের অর্থ খুঁজে পান। উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে শেখেন। পুরুলিয়ার মাঠা পাহাড়ে বা বাঁকুড়ার শুশুনিয়ায় শৈলারোহণ শিবিরে বহু কিশোর-কিশোরী স্বনির্ভর হওয়া শেখে। নতুন নতুন পাহাড়ি পথের সন্ধান করার সময় পাহাড়ের বিশেষ মানচিত্র বা কন্টুর ম্যাপ দেখা শেখা যায়। পাহাড়ি পথে বেশ কিছু অভিজ্ঞ ও মানবসম্পদে সমৃদ্ধ মানুষজনের সঙ্গে এক তাঁবুতে থাকার সৌভাগ্য হয়। এঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু নতুন শখ আত্মস্থ করার সুযোগ মেলে। এমনধারা মানুষদের কাছ থেকে রাতের আকাশের তারামণ্ডল দেখে দিক নির্ণয় করা ও চাঁদের আকার ও আকাশে ওঠার সময় দেখে পক্ষ ও তিথি সম্বন্ধে ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ মিলে যায়। এ ছাড়া শেখা যায় কম্পাসের ব্যবহার, গাছপালা ও বনৌষধি গুল্ম চেনা, পাখি দেখা ইত্যাদি। পাহাড়ি পথে চেনা বা অচেনা, নিজের দলের বা দলের বাইরের মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সাবলীল ও সহজ। নিজের বৃত্তের মধ্যে সেঁধিয়ে থাকার উপায় বা ইচ্ছে থাকে না। মোবাইল ফোন, টেলিভিশন বা ইন্টারনেট মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রাণের যোগাযোগের মধ্যে দেওয়াল হয়ে খাড়া থাকে না। পাহাড়ের ঢালে বা জঙ্গলের মাঝে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে সবাই রান্ন করার জন্য ঈষৎ বড় তাঁবুতে এসে জড়ো হয়। তখন রান্না-তাঁবুর বাইরে আর কোনও আকর্ষণ থাকে না। রান্নার সঙ্গে সঙ্গে খোশ গল্পে মেতে ওঠে সবাই। এমনকি রান্নার সময়ে খুন্তি নেড়ে হাত পাকানোরও সুযোগ মেলে। যে কোনও অভিযানে কাল্পনিক ও বৈদ্যুতিন মাধ্যম নির্ভর অবসর যাপনের নেশার বদলে ক্রমাগত বিলীয়মান মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলার অভ্যাস গড়ে ওঠে। যে কয়েকটা দিন বিদ্যুৎ, মোবাইল, টেলিভিশন, সংবাদপত্রবিহীনভাবে পাহাড়ের পথের ধূলিশয্যায় কাটে, সেই কয়েকটা দিনের সুখস্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে অমলিন থেকে যায় সারাজীবনের জন্য। আমার এক সহযাত্রীর জবানিতে, পাহাড়ে কয়েকটা দিন হাঁটাহাঁটি করে শহরে ফেরার পরে তার নাকি কর্মক্ষমতা বেড়ে যায় কয়েক গুণ। কয়েকটা দিন কর্মহীনতার ক্ষতি পুষিয়ে যায় সুদে-আসলে। এর চেয়ে সত্যভাষণ আর কিছু হতে পারে না।

উমা

স্কুলপাঠ্য বইয়ের বাংলাভাষাঙ্গ্ম কয়েকটি পর্যবেক্ষণ

ভূপতি চক্রবর্তী

দুটি স্কুলের ছাত্রের কথোপকথনের খানিকটা কানে পৌঁছল, সেটা দিয়েই শুরু করা যাক।

'আরে মৈনাক হাউ আর ইউ?'

'বিন্দাস।'

'অনিকেতের হাল হকিকত জানিস? নাম্বার আছে?'

'না রে, আমার কোনো জানকারি নেই।'

'তোদের সিট তো পড়েছে গব্বরের ডেনে!'

'কোনো চাপ নেই, টেনশান নিচ্ছি না।'

এরকমভাবেই তাদের কথোপকথন চলছিল। লক্ষ্য করলাম কত কম বাংলা শব্দ ব্যবহার করে তারা দিব্যি নিজেদের মধ্যে বাংলাতেই কথাবার্তা চালাচ্ছে এবং সম্ভবত পরস্পরের কাছে নিজের বক্তব্য বেশ স্পষ্টভাবেই তুলে ধরতে পারছে। হিন্দি ও ইংরেজি শব্দ বহুল পরিমাণে নানা জায়গায় শোনা যাচ্ছে। সকলেই প্রায় বুঝছেন তাই সুবিধাজনক শব্দ নির্বাচন ও প্রয়োগ হচ্ছে। সম্ভবত পরস্পরের কাছে নিজের বক্তব্য বেশ স্পষ্টভাবেই তুলে ধরতে পারছে। সম্ভবত এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিক হয়ত বা হিন্দি ছাড়া ভারতের আরও অনেকগুলি ভাষা— যে ভাষায় বহু মানুষ কথা বলেন, অর্থাৎ তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মালয়ালম, মারাঠি, ওড়িয়া, গুজরাটি, অসমিয়া প্রভৃতি সব ভাষাতেই এমনটা ঘটছে।

নিজেদের দিকে দৃষ্টি ফেরালাম। সন্দেহ নেই, অনেক বেশি ইংরেজি শব্দ বাংলা কথোপকথনে আমরাও ব্যবহার করছি। পুরো ইংরাজি বাক্যও শিক্ষিত মহলে বহুল ব্যবহৃত ও জনপ্রিয়। হিন্দির ব্যাপারে পঞ্চাশোর্ধ্ব বাঙালির স্বাচ্ছন্দ্য আমার মনে হয়েছে কিঞ্চিৎ কম। তাই তাদের মধ্যে হিন্দি শব্দের প্রয়োগ তুলনায় বেশ কম; পুরো হিন্দি বাক্য প্রায় অনুপস্থিত। সম্ভবত সেই কারণে তাদের দৈনন্দিন ভাষায় বাংলা শব্দের প্রয়োগ তুলনায় বেশি। অথবা তা যদি বেশি নাও হয়, বাংলা শব্দের সম্ভার তাদের তুলনায় বেশি। এখানে স্কুল বা কলেজে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের ভাষার ব্যবহার ও শব্দপ্রয়োগের পদ্ধতির সঙ্গে তাদের পার্থক্য রয়েছে।

খুব স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠবে যে, কেন এমন একটা প্রসঙ্গের উপস্থাপনা করা হচ্ছে। ভাষার যে একটি চলমান সত্ত্বা রয়েছে, ভাষা যে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন শব্দ ও তার ব্যবহারের গ্রহণ ও বর্জনের মধ্যে দিয়ে চলে তা আমাদের জানা এবং যে ভাষাগুলি পরস্পরের সংস্পর্শে থাকে অর্থাৎ যে সব ভাষাভাষী মানুষ পরস্পরের সঙ্গে মেশেন, যাঁরা অন্য ভাষার সঙ্গে পরিচিত হন, পারস্পরিক মেলামেশা, সামাজিক আদান-প্রদান বা বিজ্ঞাপন, টেলিভিশন, সোশ্যাল মিডিয়া, সিনেমা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে সেখানে ভাষার পরিসর নিশ্চিতভাবেই বেড়ে যায়। আমরা বাংলাতে তেলুগু বা মালয়ালম থেকে শব্দ নিতে পারি না (যদিও বহু সংস্কৃত তৎসম শব্দ অন্য বহু ভারতীয় ভাষার মতো ঐ দুটি ভাষাতেও রয়েছে), কিন্তু হিন্দি এবং ইংরাজি থেকে গ্রহণের পরিমাণ অনেক বেশি এবং সম্ভবত স্বতঃস্ফূর্তও। তবে খানিকটা সান্ত্বনা হয়ত পাওয়া যায় যখন দেখি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কয়েক বছর অন্তর যে ইংরাজি অভিধানের নবতর সংস্করণ প্রকাশ করে, তাতে আরও বেশি ভারতীয় ভাষার শব্দ যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ ইংরাজি ভাষাভাষীরাও কিছু বিশেষ ভারতীয় ভাষার শব্দ প্রয়োগ করে তাঁদের মনের ভাব বেশি ভালো করে প্রকাশ করতে পারছেন।

ফিরে আসা যাক বাংলার কথায়। আমাদের কথ্যভাষায় শব্দপ্রয়োগের যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন গত দু-আড়াই দশকে ঘটে গেল, লিখিত ভাষায় তার কতটা প্রতিফলন হয়েছে? সাহিত্য বা সৃজনশীল লেখায় তার প্রভাব পড়েছে কিংবা নতুন শব্দকে সচেতনভাবে আনা হয়ত হয়েছে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের ভাষার ক্ষেত্রে তেমন তো ঘটে নি! না ঘটাই স্বাভাবিক। কারণ

প্রথাগতভাবে সেখানে বিশুদ্ধ বাংলারই থাকার কথা। বাংলাতে উপযুক্ত শব্দ যথেষ্ট রয়েছে, তাই অসুবিধা হওয়ারও কথা নয়। যদিও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে কোনো ভারতীয় ভাষার মতো বাংলারও কিছু অপ্রতুলতা লক্ষ্য করা যায়। সে কথায় না হয় পরে আসা যাবে।

যে প্রশ্নটার মুখোমুখি হওয়ার প্রয়োজন, তা কিন্তু কিছুটা ভিন্ন। আমাদের ছাত্রদের হাতে বিদ্যালয়পাঠ্য বাংলা ভাষায় লেখা বিভিন্ন বিষয়ের যে বইগুলি তুলে দেওয়া হচ্ছে আমরা একটু দৃষ্টি দেব সেই দিকে। কোন বিষয় বা সাবজেক্টের দিকে নজর দেব তা অবশ্য এখানে খুব বড় কথা নয়, বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভাষা। যেমন ইতিহাস বইয়ের খুব পরিচিত একটি বাক্যের কথা ধরা যাক– 'ক' রাজার কুশাসনে অচিরেই তার রাজ্যের পতন ঘটল।' এই বাক্যটির অন্তত দু-তিনটি শব্দ কিন্তু আজকের ছাত্রদের কাছে খুব চেনা নয় এবং দৈনন্দিন জীবনে তাদের প্রয়োগ প্রায় হয় না বললেই হয়। 'কুশাসন' 'অচিরেই' তো এখন বেশ অচেনা, এমনকি 'পতন' শব্দটিও পড়ার বইয়ে বিভিন্ন বিষয়ে মেলে, রোজকার জীবনে নয়।

অথবা ধরুন, ভূগোল বইয়ের একটি বাক্য। 'বিভিন্ন ঋতুতে জলস্তরের পার্থক্যের জন্য এই জলাধার নিয়ন্ত্রিত উপায়ে ব্যবহার করতে হয়।' এখানেও একাধিক শব্দ রয়েছে, যেমন জলস্তর, জলাধার, নিয়ন্ত্রিত প্রভৃতি, যা নিত্যকার ভাষায় ঠাঁই পায় না। পদার্থবিদ্যার এক অতি পরিচিত আর্কিমিডিসের নীতি তো তার ভাষার জন্য বহু ছাত্রের কাছে এক অতি কঠিন নীতিতে পর্যবসিত হয়েছে। এখানে একবার নীতিটির বিবৃতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। আর্কিমিডিসের নীতি বলছে, 'কোনো বস্তুকে কোনো প্রবাহীতে (তরল বা গ্যাসীয় পদার্থে) আংশিক বা পূর্ণ নিমজ্জিত করলে তার ওজনের আপাত হ্রাস ঘটে, ওজনের এই আপাত হ্রাস বস্তু কর্তৃক অপসারিত প্রবাহীর ওজনের সমান।' 'তরল বা গ্যাসীয় পদার্থে' অংশটি আমার সংযোজন, সর্বত্র তা নাও পাওয়া যেতে পারে।

বিবৃতিটির ভাষার কাঠামো অসাধারণ, প্রায় পাঁচ দশক আগে স্কুলের ছাত্র হিসেবে যখন এই নীতিটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম ভাষা কিন্তু খুব কঠিন মনে হয় নি, যদিও নীতিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলি খুব সহজ ছিল না। খুবই পরিচিত এবং আমাদের নৈমিত্তিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা অনেকগুলি ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এই নীতিটির মধ্যে লুকিয়ে আছে। তার ওপর পদার্থবিদ্যার একটা অন্যতম চরিত্র যাকে বলা হয় সত্ত্বা বিরোধী বা counter intuitive অর্থাৎ যা সহজ স্বাভাবিক যুক্তিতে ঠিক মনে হয় অথচ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তার বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিচ্ছে এমন বিষয়টি এখানে খুবই প্রবল। তাই এই নীতির ওপর ভিত্তি করে যে সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়, তার অন্যতম যেমন — কেন লোহার সূঁচ জলে ডুবে যায় কিন্তু লোহার তৈরি বড় জাহাজ জলে ভাসে কিংবা জলে ডুব দিলে হালকা লাগে অথচ বাইরে এলে আবার ভারী, এরকম পরিচিত সত্ত্বাবিরোধী জিজ্ঞাসার জবাব মেলে আর্কিমিডিসের নীতির ওপর ভিত্তি করে।

এ তো গেল নীতিটির বৈজ্ঞানিক দিক। দেখা যাক, এর ভাষার বিষয়টি। পঞ্চাশ বছরে কিশোর ছাত্রদের ভাষায় শব্দ সম্ভার যথেষ্টই পাল্টে গেছে। তাই এখানকার প্রবাহী, আংশিক, পূর্ণ নিমজ্জিত, আপাত হ্রাস, অপসারিত এমন শব্দগুলি এখন অধিকাংশ ছাত্রদের কেবল কথ্য ভাষা নয়; সম্ভবত তাদের পরিচিতির বাইরে চলে গেছে। তাই এমন চমৎকার শব্দ ও শব্দবন্ধ বিশিষ্ট নীতিটির বিবৃতি ছাত্রদের কাছে যথেষ্ট কঠিন বলে মনে হচ্ছে। বস্তুত এই পরিপ্রেক্ষিতে আর্কিমিডিসের নীতির একটি ভাষাগত বিকল্প বিবৃতি উপস্থাপনার চেষ্টা করা যাক। সেখানে বাংলা শব্দ রেখে তা কতটা আজকের কিশোর ছাত্রের ভাষাকে ছুঁতে পারে তা একবার চেষ্টা করে দেখা যায়।

তাহলে এই বিবৃতিটি কী দাঁড়াবে? প্রস্তাবনা হিসেবে বলা যায়, 'কোনো বস্তুকে পুরোটা বা খানিকটা কোনো গ্যাস বা তরলে ডোবালে তার ওজন সেই সময় সাময়িকভাবে কমে যায়। এই কমে যাওয়ার পরিমাণ বস্তু যতখানি তরল বা গ্যাস সরিয়ে দিয়েছে, তার ওজনের সমান।" এর অবশ্যই রকমফের হতে পারে— এটা একটা প্রস্তাবনা মাত্র।

লক্ষ্য করা গেছে, সব বয়সের শিক্ষকেরাই চান পাঠ্যবইয়ে একটা মর্যাদাসম্পন্ন ভাষা থাকুক। কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হিন্দি বা ইংরাজি শব্দ তো নয়ই, অধিকাংশ শিক্ষকই চান, বিভিন্ন বিষয়ের স্কুলপাঠ্য বইতে ভাষার চালু কাঠামোটি বজায় থাকুক। অনেকেই মনে করেন, এর ফলে ছাত্রদের বিষয়ের প্রতি একটা সম্ভ্রম থাকবে এবং তাদের ভাষাজ্ঞান ও শব্দের ভাণ্ডারও সমৃদ্ধ হবে। এই মতামতটি অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত ও গুরুত্বপূর্ণ। তবে, আমার মনে হয়, কিছু শব্দ, তা অবশ্যই বাংলা হতে হবে, ব্যবহার করে যদি বিজ্ঞানের বিষয়গুলি ছাত্রছাত্রীদের ভাষার আরেকটু কাছাকাছি নিয়ে আসা যায়, তাহলে সম্ভবত ভালোই

হবে, আর তাই আর্কিমিডিসের নীতির বিবৃতিটির একটি সহজতর কিন্তু সঠিক ও দৃঢ়বদ্ধ বিবৃতি সন্ধানের প্রয়োজন বোধ করছি।

এরকম চিন্তার পেছনে আরও একটি কারণ রয়েছে। কেউ যদি এখনকার মাধ্যমিক পাঠ্যসূচির বিজ্ঞান বিষয়ের দিকে নজর দেন তাহলে লক্ষ্য করবেন, বছর পনেরো আগেকার তুলনায় কত বেশি এবং দুরূহ বিষয় সেখানে সংযোজিত হয়েছে। আমরা যদি মনে রাখি যে, মাধ্যমিক স্তরে অবশ্যপাঠ্য বিজ্ঞান প্রায় শতকরা ৮০জন ছাত্র পরবর্তী স্তরে আর পড়ে না অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান নয় অন্য শাখায় পড়াশোনা শুরু করে, তাহলে এই প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই উঠবে যে, কেন এত বেশি বিষয়ের বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। যদি আমরা মেনে নিই যে, একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে যে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষটি আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে, তাকে বহু বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান জোগান দিচ্ছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা, তাহলে কিন্তু বিষয়গুলি সহজ ভাষায় আরও আকর্ষণীয়ভাবে পরিবেশনের দায়িত্ব নীতিনির্ধারকদের ভাবতে হবে ভবিষ্যতের কথা ভেবে এবং যে দায়িত্ব পালন করবেন উপযুক্ত শিক্ষাবিদেরা। তাই মনে হয়, সহজ করে ভাষা নির্বাচন ছাড়াও বাংলা বিজ্ঞান বইয়ে যে কোনো বৈজ্ঞানিক শব্দের পাশে বন্ধনীর মধ্যে ইংরাজি শব্দ দিয়ে দেওয়া ভালো। বৃহত্তর জীবনে বিজ্ঞান বিষয়ে প্রায় সকলেই ইংরাজি প্রতিশব্দটিই ব্যবহার করতে স্বচ্ছন্দ — অর্থাৎ আবার সেই কথ্য ভাষার প্রসঙ্গ এখানে এসে যাচ্ছে।

বাড়িতে ইলেকট্রিকের কোনো কাজকর্মের জন্য যে মেকানিক আসেন তিনি কিন্তু বাংলা ভাষায় কোনো টেকনিক্যাল কথা বলেন না। তার মুখে শোনা যায় কারেন্ট, আর্থিং, নিউট্রাল, লোড, ফেজ প্রভৃতি শব্দ। বাসে বা গাড়িতে যাতায়াতের সময় কোথায়ই বা বেগ, গতিবেগ, ত্বরণ, মন্দন, বল প্রভৃতি বলি? স্পিড, অ্যাকসিলারেশন এবং অ্যাক্সিলারেটার বা ফোর্স এখন অনেক চেনা শব্দ। আমার এই কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে যখন আমরা ছাত্রদের কথ্যভাষা পাঠ্য বইতে পরিবেশন করতে পারব না, তখন অন্তত ভৌত ও জীববিজ্ঞান (এবং ভূগোলের) ক্ষেত্রে ইংরাজি প্রতিশব্দের সঙ্গে পরিচিতি ঘটিয়ে বৈজ্ঞানিক নামগুলি বহু ক্ষেত্রে সহজ করে দেওয়া যায়, কারণ তার সঙ্গে এখন ছাত্রদের পরিচিতি বেশ গভীর। বাংলা বৈজ্ঞানিক শব্দের পাশে বন্ধনীতে ইংরাজি প্রতিশব্দ রাখার ব্যবস্থা থাকলে অন্তত কিছু ছাত্র যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভাষাগতভাবে আরও স্বচ্ছন্দ হয়ে যাবে তা প্রায় জোর দিয়ে বলা যায়। এর সঙ্গে যদি সামগ্রিক প্রক্রিয়াটির মধ্যে একটু শিক্ষকদের উৎসাহ যুক্ত হয় তাহলে বিশ্বাস করি সাফল্য দেখা যাবে স্পষ্টতরভাবে।

সকলেই স্বীকার করেন যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য বিষয়টি ছাত্রকে সঠিকভাবে কার্যকর উপায়ে শেখানো। এই কাজে ভাষার ভূমিকা যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তা সহজেই বোঝা যায়। অতএব বোধহয় বিজ্ঞান ও অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের ভাষা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে যে ছাত্রছাত্রীরা একই পাঠ নিচ্ছে, তাদের মধ্যে পার্থক্যের মাত্রা বড়ই প্রকট। ভাবনা, শুদ্ধ শব্দ সমৃদ্ধ বাংলা ভাষা তাদের অনেকেই প্রয়োগ দূরে থাক শ্রুতিগোচর করার সুযোগও পায় না। শিক্ষকরাও বিষয়টি শ্রেণীকক্ষে অনুভব করেন। নানা ধরনের পরিপ্রেক্ষিত থেকে একই শ্রেণীর পাঠকক্ষে যে ছাত্রছাত্রীরা এসে বসছে তাদের কথা মাথায় রেখে বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের ভাষা একটু সহজ করে তোলা বিশেষভাবে প্রয়োজন। আক্ষরিক অর্থে সর্বশিক্ষার জন্য যে সব প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে তার সঙ্গে এই উদ্যোগটিও যুক্ত করার চিন্তাটা শুরু হোক এখনই।

উমা

বাঁধ বন্যা বিপর্যয়

ফি বছর বর্ষা মানেই বন্যা। বন্যা নিয়ে এর আগে আমাদের দুটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বন্যা এখনও প্রাসঙ্গিক। তাই সমসময়কে ধরে উৎস মানুষ প্রকাশ করতে চলেছে নতুন সঙ্কলনগ্রন্থ।

শীতল বরফ ও উষ্ণ বিতর্ক

অরুণালোক ভট্টাচার্য

আশির দশকের মাঝামাঝি সময়। মে মাসের বিকেলবেলা। দক্ষিণ কলকাতার এক স্কুলে ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠত। হৈ হৈ করে গেট খুলে বেরিয়ে আসত একঝাঁক ছাত্র। গরমে, ঘামে ভেপসে-যাওয়া কতগুলো কচিকাঁচা শুকনো মুখ। গেটের বাইরে কালুদা তখন তৈরি তাঁর পসরা নিয়ে। এক টুকরো বরফকে কুচিয়ে, একটা গোলমতো চাকতিতে জোরসে চেপে তাতে একটা কাঠি গুঁজে দিলেই তৈরি হত দিশি আইসক্রিম। তাতে অনুপান পড়ত লাল, হলুদ, সবুজ সিরাপ। অনেকে কাচের গ্লাসে বরফকুচি আর রঙ দেওয়া সরবত খেত। কালুদা কোথা থেকে বরফ কিনত বা সেই বরফ কোথায় জমানো হত বা কোন জল থেকে সেই বরফ তৈরি হত, অতশত কিশোর ছাত্রদের মাথায় ঢুকত না। জানা ছিল না, ওই লাল, হলুদ রঙ খাবার ব্যবহারের যোগ্য কি না কিংবা মিষ্টি স্যাকারিনের কারণে কি না। ঐ কাঁঠাল-পাকা গরমে অন্যান্যদের মতো এই প্রতিবেদকের কাছেও কালুদার বরফের আইসক্রিমের স্বর্গীয় স্বাদ ছিল অতুলনীয়। পাড়ায় পাড়ায়, স্কুলের আশপাশে কালুদাদের মতো দোকানিরা কাঠের ঠেলাগাড়ি নিয়ে বসতেন। ষাট-সত্তর দশকে এ ছিল শহর কলকাতার পরিচিত দৃশ্য। এখন এরই শোভন সংস্করণ 'গোলা' নামে বিক্রি হয় দোকানে। পরে, আর একটু বয়স বাড়লে, বাজারে যেতে হত মাঝে মধ্যে। বাজারের থলি হাতে ধরিয়ে দিয়ে মা যে চেতাবনিগুলো দিতেন, তার মধ্যে একটি ছিল বরফের মাছ না আনার। নজর করতাম, কিছু মাছ রাখা আছে বরফের মধ্যে। আস্তে আস্তে বুঝতে পেরেছিলাম, বরফ শুধু খাওয়ার জিনিস নয়, বিভিন্ন জিনিস সংরক্ষণেও এর এক বহুমাত্রিক ব্যবহার রয়েছে। মাছ থেকে মৃতদেহ— সবকিছুর পচন ঠেকাতে বরফ যেন মৃতসঞ্জীবনী।

২৮ জুলাই ২০১৭-র এক দৈনিক পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়, যার মূল বক্তব্য ছিল, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-এর স্বাস্থ্য আধিকারিকরা একটি বরফ কারখানা পরিদর্শন করতে গিয়ে তাতে বিস্তর গরমিল পেয়েছেন। গরমিলটা কোথায়? দেখা গেল, সেই কারখানায় যে বরফ তৈরি হচ্ছে, তা একাধারে যেমন শিল্প-বাণিজ্যে ব্যবহার হচ্ছে (পরিভাষায় যাকে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইস' বলা হয়), সেই একই বরফ বিকিয়ে যাচ্ছে সরবতের দোকানে, পানের দোকানে বা ফলের রসের গ্লাসে এডিব্‌ল আইস হিসাবে। তবে কি সবরকম বরফ খাওয়ার উপযুক্ত নয়? বরফের এই প্রকারভেদ কেন? তাহলে কি দুই ধরনের বরফের গুণগত ফারাক রয়েছে?

এবারে একটু শিবের গীত গাই। যিশুর জন্মের প্রায় হাজারখানেক বছর আগে, চীনদেশে নাকি বরফ ব্যবহৃত হত খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের জন্য। আনুমানিক ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারত ও মিশরে শীতের রাতে খোলা আকাশের নীচে মাটির পাত্রে জল রেখে সেটিকে বরফে পরিণত করার নিদর্শন মিলেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমেরিকান চাষিরা পুকুরের জলে বরফ জমিয়ে ব্যবসা করতে শুরু করল। ইতিমধ্যে ১৮০২ সালে টমাস মুর নামে এক আমেরিকান সাহেব এক বরফ-বাক্স আবিষ্কার করে ফেললেন। তাঁর ছিল দুধ-মাখনের ব্যবসা। সেডার কাঠের বাক্সের ভিতরটা খরগোশের চামড়া দিয়ে ইনস্যুলেট করা, বাইরে একটি ধাতুনির্মিত চাদর। সেই বাক্সে বরফ-বেষ্টিত হয়ে মুর সাহেবের তৈরি মাখন পাড়ি দিত মেরিল্যান্ড থেকে ওয়াশিংটন। এই প্রসঙ্গে ফ্রেডেরিক টুডর সাহেবের কথা বলতেই হবে। বোস্টনের এক ধনী পরিবারের ছেলে। পড়াশোনায় খুব মনোযোগী নন। ভাই উইলিয়ামের উৎসাহে বরফ রপ্তানির ব্যবসায়ে নামলেন। প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে প্রায় বছর পনের পরে তিনি হয়ে উঠলেন বরফ ব্যবসার সম্রাট। আস্তে আস্তে খাদ্যবস্তু হিসাবে বরফের জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগল। বিশ শতকের প্রথমার্ধে দুটি জিনিস ঘটল, যার ফলে বরফের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিটাই বদলে গেল। প্রথমত, দুটি বিশ্বযুদ্ধ। এর পরেই মানুষের মধ্যে শাকসবজি, মাখন, খাবার সতেজ রেখে খাওয়ার প্রবণতা বাড়তে লাগল। ইংল্যান্ড-আমেরিকায়

শ্রম-শিল্পের প্রসার ঘটেছে অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়েই। বিশ্বযুদ্ধের পরে অন্যান্য দেশেও শ্রম-শিল্পের বিস্তার ঘটতে থাকল। শিল্প-বাণিজ্যের কল-কারখানাতেও শুরু হল বরফের ব্যবহার। খাদ্যবস্তুর বাইরে বরফের ব্যবহারের চাহিদা বাড়তে থাকল। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটল ১৯১৪ সালে, যখন রেফ্রিজারেটর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। রেফ্রিজারেটর নিয়ে কাজকর্ম চলছিল সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই। সেটি ঘরে ঢুকতে সময় নিল প্রায় এক শতাব্দী। ঘরের মধ্যে ফ্রিজ পেয়ে যাওয়াতে সারা পৃথিবীর মানুষ বরফের ঘরোয়া ব্যবহারে আরও অভ্যস্ত হয়ে উঠল। বরফ সরকারিভাবে খাদ্য হিসাবে স্বীকৃতি পেলেও তার মোড়ক, মানে প্যাকেজিংয়ের ব্যাপারটি বহুদিন কারো গোচরে আসেনি। এই সময়কার একটি ঘটনা— বরফ তৈরি এবং তার প্যাকেজিং নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল। ১৯৮৭ সালে পেনসিলভানিয়া-কর্নেল দলের ফুটবল খেলার পরে, খেলোয়াড় দর্শক ছাত্র সমর্থক– সক্কলে পেটের রোগে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল যে, খেলার পরে প্রায় সবাই বরফের সরবত খেয়েছিলেন। আরও খোঁজখবর করে দেখা গেল, যে কুয়োর জল দিয়ে বরফ তৈরি করা হয়েছিল, সেটি বন্যার জলে দূষিত হয়ে গিয়েছিল। ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের চোখ খুলে দেয়। ভোজ্য বরফ এবং খাদ্যবস্তুতে ব্যবহৃত বরফের পরিশোধন এবং প্যাকেজিং নিয়ে নতুন বিধিনিষেধ আরোপিত হল।

তাহলে আমরা আমাদের দেশে কীভাবে বুঝব বরফের ভালো-মন্দ? ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অভ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই) ২০১৭ সালের ২৫ এপ্রিল, খাদ্য সংরক্ষণ মজুত এবং সরবরাহে ব্যবহৃত বরফের টুকরোর ব্যাপারে কয়েকটি জিনিস নজর করে— (১) খাদ্য-সম্পর্কিত যেসব ক্ষেত্রে বরফ ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলোর বেশিরভাগই তৈরি হচ্ছে অপেয় জল থেকে। বরফ তৈরি হওয়ার পরে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ পর্যন্ত কোনও ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যবিধি খুব একটা মানা হয় না। (২) ভোজ্য বরফ তৈরির ক্ষেত্রে যেরকম কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে (ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ডস রেগুলেশনস-২০১১, ২.৫.৭ বিধি), খাদ্যবস্তুতে ব্যবহৃত বরফে সেরকম কোনও বিধিনিষেধ কিন্তু নেই। (৩) যেহেতু এতদিন খাদ্যবস্তুর প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত বরফের ওপরে কোনো নজরদারি ছিল না, বরফ দূষিত থাকলে তার সংস্পর্শে আসা খাবারের গুণগত মানও খারাপ হতে বাধ্য। অতএব প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত বরফকেও ঐ একই বিধিনিষেধের আওতায় নিয়ে আসাটা জরুরি। মোটের ওপর এটা বোঝা গেল যে, খাদ্য-সম্বন্ধিত যে কোনও কাজে, সে খাবারের জন্যই হোক বা খাদ্য-সংরক্ষণের জন্যই হোক — বরফ তৈরি করতে হলে তা বিধিনিষেধ মেনেই করতে হবে। নীচের তালিকার ৯ নম্বর সারণিটি দেখলে জিনিসটা আরও পরিষ্কার হবে।

সারণিতে কয়েকটি জীবাণুর নাম দেখা যাচ্ছে, যেগুলি বরফ অবস্থাতেও সমানভাবে সক্রিয় থাকে। এইসব জীবাণু দ্বারা যে সব রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে তার তালিকাটি নেহাত ছোট নয়। রক্তআমাশা, আন্ত্রিক বা টাইফয়েড, পেটের যে সব সংক্রমণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খুব পরিচিত, সেগুলো যেমন জলবাহিত, সেরকম বরফের মাধ্যমেও হতে পারে। শুধুমাত্র পেটের রোগই নয়, দুটি হেপাটাইটিস ভাইরাস-এ এবং ই কিন্তু বরফ-ঠাণ্ডায় তাদের সংক্রমণ ক্ষমতা অটুট রাখতে পারে। সুতরাং দূষিত বরফ খেলে পেটের ব্যামো ছাড়া, জন্ডিস হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। অতএব বরফ খাওয়ার আগে বা বরফে সংরক্ষিত খাবার খাওয়ার আগে, দু দণ্ড ভাবুন— পরিস্রুত বরফ খাচ্ছেন তো? আমাদের দেশে আলাদা করে বরফবাহিত রোগের কোনো পরিসংখ্যান নেই। যেহেতু জল থেকেই বরফ তৈরি হয়, সেহেতু এটা ধরে নেওয়া হয় যে, জলবাহিত জীবাণু এবং বরফবাহিত জীবাণু একাকার। কিন্তু প্যাকেজিং সংক্রান্ত কোনো সংক্রমণ হলে সেটা বোঝা বা প্রমাণ করার কোনো উপায় কিন্তু নেই, কারণ সেই সংক্রান্ত কোনো বিধিনিষেধ বা নিয়মকানুন আমাদের দেশে অজ্ঞাত।

প্রশ্ন হল, ভাল (ভোজ্য বা এডিব্‌ল) আর অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট (শিল্পে ব্যবহৃত বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল) বরফের তফাতটা বুঝবেন কীভাবে? সাদা চোখে বোঝার কোনো উপায় নেই। যেমন জলপান করার সময়ে খালি চোখে দেখে বোঝা প্রায় অসম্ভব যে, সেটি পেয় জল কিনা, বরফের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি একই। আমরা ধরে নিই, যেখান থেকে জল সরবরাহ হচ্ছে সেখানে তার গুণগত মান যাচাই করেই জনসাধারণের জন্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। বরফের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা অনেকটা একইরকম। ২৮ জুলাইয়ের প্রকাশিত সংবাদে দেখতে পাচ্ছি, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন শহরের বরফ কলগুলিকে নোটিশ পাঠাচ্ছে যে, শিল্পে ব্যবহৃত বরফকে রঙিন করে দিতে, যাতে ক্রেতার বুঝতে অসুবিধে না হয়, কোনটি ভোজ্য আর খাদ্যবস্তুতে ব্যবহার করা যাবে, আর কোনটি খাবারের জন্য একেবারেই উপযুক্ত নয়। দেশের অন্য কোথাও এই ব্যবস্থা

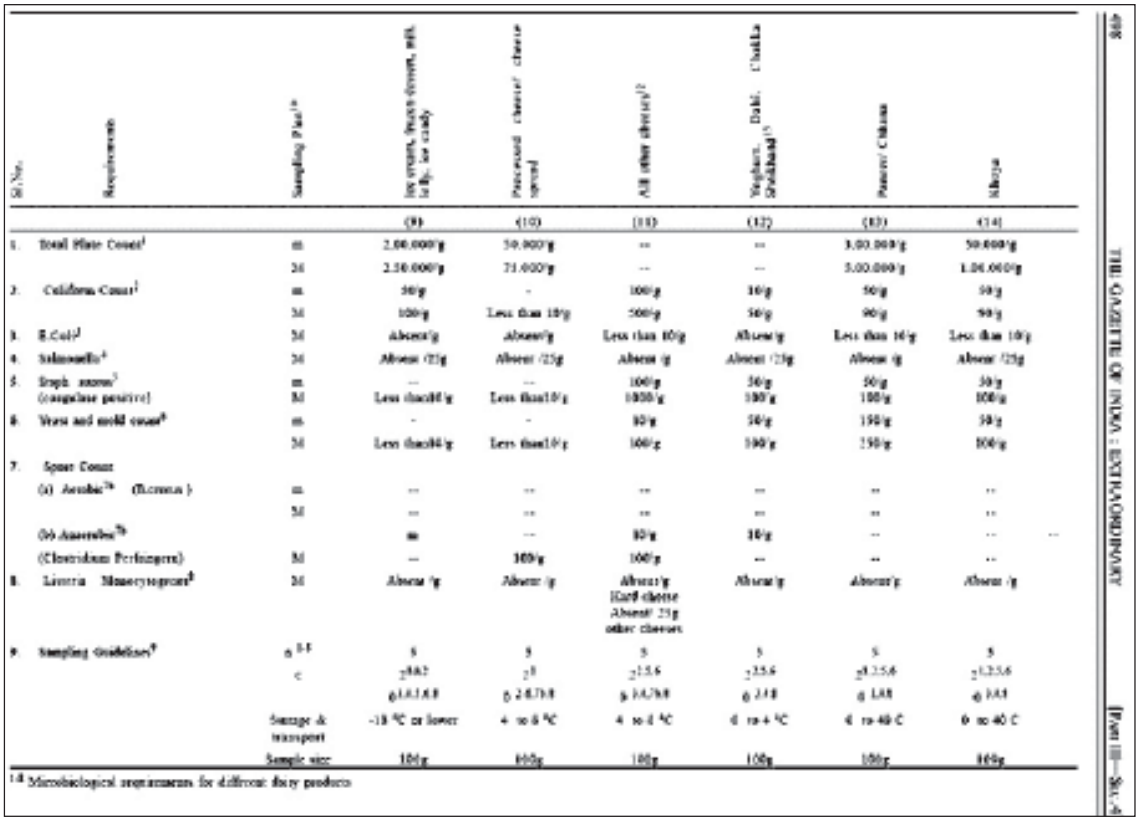

Sl. No.	Requirements	Sampling Plan[1-8]	Ice cream, frozen dessert, milk lolly, ice candy	Processed cheese/ cheese spread	All other cheeses[1,2]	Yoghurt, Dahi, Chakka, Shrikhand[1,2]	Paneer/ Chhana	Khoya
			(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Total Plate Count[1]	m	2,00,000/g	50,000/g	--	--	3,00,000/g	50,000/g
		M	2,50,000/g	75,000/g	--	--	5,00,000/g	1,00,000/g
2.	Coliform Count[2]	m	50/g	-	100/g	10/g	50/g	50/g
		M	100/g	Less than 10/g	500/g	50/g	90/g	90/g
3.	E.Coli[3]	M	Absent/g	Absent/g	Less than 10/g	Absent/g	Less than 10/g	Less than 10/g
4.	Salmonella[4]	M	Absent /25g	Absent /25g	Absent /g	Absent /25g	Absent /g	Absent /25g
5.	Staph. aureus[5] (coagulase positive)	m M	-- Less than10/g	-- Less than10/g	100/g 1000/g	50/g 100/g	50/g 100/g	50/g 100/g
6.	Yeast and mold count[6]	m	-	-	50/g	50/g	150/g	50/g
		M	Less than10/g	Less than10/g	100/g	100/g	250/g	100/g
7.	Spore Count							
	(a) Aerobic[7a] (B.cereus)	m	--	--	--	--	--	--
		M	--	--	--	--	--	--
	(b) Anaerobic[7b]		m	--	10/g	10/g	--	--
	(Clostridium Perfringens)	M	--	100/g	100/g	--	--	--
8.	Listeria Monocytogenes[8]	M	Absent /g	Absent /g	Absent/g Hard cheese Absent/ 25g other cheeses	Absent/g	Absent/g	Absent /g
9.	Sampling Guidelines[9]	n[1-8]	5	5	5	5	5	5
		c	$2^{4,6,7}$	2^{5}	$2^{1,5,6}$	$2^{2,5,6}$	$2^{1,2,5,6}$	$2^{1,2,5,6}$
			$0^{1,2,3,8}$	$0^{2,6,7,8}$	$0^{3,4,7,8}$	$0^{3,4,8}$	$0^{3,4,8}$	$0^{3,4,8}$
		Storage & transport	-18 °C or lower	4 to 8 °C	4 to 8 °C	0 to + 4 °C	4 to 40 C	0 to 40 C
		Sample size	100g	100g	100g	100g	100g	100g

1-8 Microbiological requirements for different dairy products

আছে কিনা আমার জানা নেই। বিদেশে বরফের ব্যবহার শুরু হয়েছে অনেক আগে। সেখানে ব্যবস্থাটা কীরকম? আমেরিকার এফডিএ বা ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বরফকে অনেকদিন আগেই 'খাদ্যবস্তু' বলে স্বীকার করে নিয়েছে। ফলে খুব স্বাভাবিক নিয়মেই কারখানায় তৈরি ভোজ্য বরফ জিএমপি বা গুড ম্যানুফ্যাক্চারিং প্র্যাক্টিস-এর আওতায় চলে এসেছে। সে ক্ষেত্রে বরফের গুণগত মান নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু প্যাকেজিং? সেখানেও রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল প্যাকেজ্ড্ আইস অ্যাসোসিয়েশন। যে কোনও বরফ প্রস্তুতকারক সংস্থাই এর সভ্য হতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯৯৮ সালে এই সংস্থাটি এই প্যাকেজ করা বরফের গুণগত মান যাচাই করার জন্য কিছু নিয়মাবলী প্রকাশ করে। পোশাকি ভাষায় তার নাম ছিল প্যাকেজ্ড্ আইস কোয়ালিটি কন্ট্রোল স্ট্যান্ডার্ডস প্রোগ্রাম বা সংক্ষেপে পিআইকিউসিএস। এই নিয়মগুলিই কিছুটা রদবদল করে আইন হিসাবে বলবৎ হয় ২০১১ সালে। পুরো ব্যাপারটি আইনগত হওয়ার জন্য বরফ তৈরি হওয়া থেকে শুরু করে প্যাকেজিং— পুরো প্রক্রিয়াটিই একটি অন্য মাত্রা পেয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত ভারতের মাত্র দুটি বরফ প্রস্তুতকারক সংস্থা এর সভ্যপদ গ্রহণ করেছে। বরফ তৈরির জল কতটা পরিস্রুত থাকবে, সেই ব্যাপারে ভারত সরকারের যেমন পরিষ্কার রীতিনীতি রয়েছে, বরফ প্যাকেজিংয়ের ব্যাপারে সেরকম ভারতীয় কোনও বিধিনিষেধ আছে বলে মনে হয় না।

বিজ্ঞানের হাত ধরে মানুষ যত উন্নত হয়েছে, গার্হস্থ্য জীবনের ছোটখাটো স্বাচ্ছন্দ্যও আপাতভাবে বেড়েছে। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ঘরেই তৈরি হচ্ছে বরফের টুকরো। বিভিন্ন খাদ্য এবং পানীয়ের অনুপান হিসাবে বরফ খাচ্ছেন আবালবৃদ্ধবণিতা। বরফ ভক্ষণের সাময়িক তৃপ্তির পেছনে যে সব শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে, তা হল —

১) হজমের গণ্ডগোল— বরফ খেলে সেটি যে তাপমাত্রায় পাকস্থলী বা ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছয়, তাতে ঐসব জায়গার রক্তনালীগুলি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ পাচকরসের ঘাটতি দেখা দিতে পারে এবং শেষপর্যন্ত বদহজম।

২) পুষ্টি বা এনার্জির অপব্যবহার— বরফ নিয়মিত খেলে

সেই বরফকে শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রিতে তুলতে যে পরিমাণে শক্তিক্ষয় হয়, সেটি শরীর গড়ার অন্য কাজে ব্যবহৃত হতে পারত। যদি নিয়মিত শক্তি বা এনার্জি অপব্যবহৃত হতে থাকে তবে অপুষ্টি অবশ্যম্ভাবী।

৩) গলাব্যথা বা সংক্রমণ--- আমাদের গলায় মিউকাস-এর স্বাভাবিক একটা স্তর থাকে, যা আমাদের গলাকে বাইরে থেকে আসা বিভিন্ন রকম জীবাণুর থেকে প্রাথমিকভাবে রক্ষা করে। খুব গরম বা খুব ঠাণ্ডা কিছু খেলে, সেই প্রাথমিক রক্ষাকবচটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলত সংক্রমণের সম্ভাবনা খুব বেড়ে যায়। গলাব্যথাও হতে পারে।

৪) হৃৎস্পন্দন কমে যাওয়া— খুব ঠাণ্ডা জল বা বরফ বা বাতাস যদি গলায় বা মুখের সংস্পর্শে আসে শরীরের ভেগাস নার্ভকে উদ্দীপ্ত করে। ভেগাস নার্ভ উদ্দীপ্ত হলে আমাদের স্বাভাবিক হৃৎস্পন্দনের হার কমে যায়। রোগগ্রস্ত হার্টের ক্ষেত্রে এই গতি কমে যাওয়াটা ক্ষতিকারক হতে পারে।

৫) শরীরের কোনও জায়গায় চোট লাগলে বা কেটে গেলে বরফ লাগানোর বা আইস-প্যাক দেওয়ার একটা প্রচলন অনেকদিন থেকেই আছে। এটার কিছুটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যে নেই, তা নয়। মচকানো ব্যথা বা কালশিরা পড়ে যাওয়া জায়গায় অল্পক্ষণের জন্য বরফ লাগালে সেটি চামড়ার নীচে জমে যাওয়া রক্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। ফলে চামড়ার নীচের বা বাইরের অল্পস্বল্প রক্তক্ষরণ তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। রক্তনালীগুলো ঠাণ্ডায় সঙ্কুচিত হয়ে যাওয়ার ফলে, রক্তবাহিত প্রদাহ-সৃষ্টিকারী রাসায়নিক সামগ্রী (inflammatory mediators) চোটগ্রস্ত জায়গায় এসে পৌঁছায় না। ফলে মচকে যাওয়া জায়গা ফুলে যাওয়া বা লাল হয়ে যাওয়ার প্রবণতা কমে যায়। তবে বেশিক্ষণ ধরে বরফ সেঁক দিলে চামড়ার ক্ষতি হতে পারে। রক্তনালীগুলোও বেশিক্ষণ সঙ্কুচিত হয়ে থাকলে শরীরের স্বাভাবিক আরোগ্য প্রয়াস বিঘ্নিত হয়।

এ ছাড়া আরও আছে। ধরুন কেউ কচরমচর করে সুপুরি চিবানোর মতো করে ক্রমাগত বরফ চিবিয়েই যাচ্ছেন। এই বরফখেকো বা প্যাগোফেজিক মানুষটি বা শিশুটির কিন্তু মাথার ব্যারাম হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। পাইকা এমন একটি রোগ, যেটিতে মানুষটি বা শিশুটির অখাদ্যের প্রতি এক তীব্র আকর্ষণ থাকে। সেই অখাদ্যগুলি চক, বালি, কাচ, পেরেক, বরফ— যা খুশি হতে পারে। প্যাগোফেজিয়া বা বরফ-আসক্তি এই পাইকারই এক রকমফের। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এই প্যাগোফেজিকরা আয়রন বা লৌহ-হীনতাজনিত অ্যানিমিয়াতে ভুগছেন। এই ধরনের অ্যানিমিয়া হয়ত বরফখেকো হওয়ার একটি কারণ। নেশাগ্রস্তের মতো বরফ চিবোলে কিন্তু দাঁতের এনামেল নষ্ট হয়ে গিয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারে।

শিল্পে ব্যবহৃত বরফ ক্রমাগত খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহৃত হওয়াতে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অভ ইন্ডিয়া প্রমাদ গুনেছেন। সমস্যার গভীরতা আন্দাজ করে ২০১৭ সালেই তাঁরা যে সব বিধিনিষেধের কথা বলেছেন, সেগুলি আমরা আলোচনা করেছি। এতসব নিয়ম মেনে ভোজ্যবরফ তৈরি করলে তার খরচও বাড়বে। শরীর ঠিক রাখতে সেই কষ্টটুকু উপভোক্তাদের মেনে নিতেই হবে। তাই বাজারে মাছ কিনতে গিয়ে মাছের সঙ্গে সঙ্গে যে বরফে মাছটি সংরক্ষিত তার দিকেও নজর করুন— আরও স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠুন। খাওয়ার ক্ষেত্রে যাঁদের বাড়িতে রেফ্রিজারেটর আছে, তাঁরা বাড়িতে জমানো বরফ ব্যবহার করলে সবচেয়ে ভাল। অনেক দোকানও বাজারি বরফ না কিনে রেফ্রিজারেটরে জমানো বরফ ব্যবহার করছে। উত্তর কলকাতার প্রায় শতাব্দীপ্রাচীন সরবতের দোকান 'কপিলাশ্রম' বাড়িতে রেফ্রিজারেটরে জমানো বরফ সরবতে ব্যবহার করে। সাধারণ মানুষকে এদিক থেকে কিছুটা দোকানির সততার ওপরে নির্ভর করতে হয়। সবাই সচেতন হলে দোকানিও শিল্পে ব্যবহৃত বরফ ব্যবহার করা থেকে বিরত হতে পারে।

তথ্যসূত্রঋণ

1.Kolkata municipality suggests coloured industrial ice to stop indiscriminate use - Saikat Ray/TNN/July 28, 2017.

2.The ice Safety Practices of Reddyice Features - Cover Story - A Look at the "Ice Safety" Practices Dec 11, 2015 - Lisa Lupo.

3.International Packaged Ice Association_ The History of ice.

4. Food Safety helpline.com

5. Indian Standard DRINKING WATER -- SPECIFICATION (Second Revision) - Amendment No1, June 2015 to IS 10500:2012: DRINKING WATER- SPECIFI CATION (Second revision)

উমা

ই-বর্জ্যঃ এক নতুন সঙ্কট

নন্দগোপাল পাত্র

একটি বইয়ে পড়া কোনো এক কর্মশালায় আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক পল কনেট প্রশ্ন করলেন, 'চিনির সঙ্গে নুন মেশালে কী হয়?' হলভর্তি শ্রোতাদের মধ্যে বেশ কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা। এরপর প্রশ্নকর্তা নিজেই উত্তর দিলেন— 'আবর্জনা'। বিগত শতকের বিপ্লব ও তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগতি মানুষের জীবনে নিয়ে আসে জীবনযাত্রার ব্যাপক পরিবর্তন। এই অগ্রগতির পাশাপাশি মানবজীবনে আসে এক নতুন সঙ্কট— আবর্জনা। বর্তমান সময়ে পরিবেশবিদদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে এই আবর্জনার এক রূপ ই-আবর্জনা বা ই-বর্জ্য। গত এক দশকে জীবনযাত্রার মান ক্রমশ উন্নত হয়ে উঠছে। আর যত বেশি উন্নত হওয়া, তত বেশি বর্জ্য তৈরি করা। অর্থাৎ ভোগবাদ সমাজে যত বাড়ছে, পাল্লা দিয়ে অন্যান্য বর্জ্যের সঙ্গে বৈদ্যুতিন বর্জ্যের পরিমাণ বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। এই ধরনের পণ্য উৎপাদকেরাও প্রযুক্তির অগ্রগতিকে হাতিয়ার করে এমন পণ্য উৎপাদন করছে, যা দ্রুত বদলানোর প্রয়োজন হচ্ছে। ফলে জমে উঠছে ইলেকট্রনিক বর্জ্যের পাহাড়।

জার্মানের ইউনাইটেড নেশনস্ ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট ফর দ্য অ্যাডভান্সড স্টাডি অভ সাসটেনিবিলিটি বিভাগের গ্লোবাল ই-ওয়েস্ট মনিটর ২০১৪-র রিপোর্ট অনুযায়ী ই-বর্জ্য হল বাতিল ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইক্যুইপমেন্ট (ই ই ই)। ওই রিপোর্টে ই-বর্জ্যের ছটি ভাগের উল্লেখ রয়েছে। (ক) তাপমাত্রা পরিবর্তন হয় এমন যন্ত্র— ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার, (খ) টিভি, কম্পিউটারের স্ক্রিন বা মনিটর, নোটবুক, ট্যাবলেট, (গ) বড় বৈদ্যুতিক যন্ত্র — ওয়াশিং মেশিন, কাপড় শুকানোর মেশিন, ছাপাখানার মেশিন, জেরক্স মেশিন, সৌরকোষ প্যানেল, (ঘ) ছোট বৈদ্যুতিক যন্ত্র— ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, মাইক্রোআভেন, টোস্টার, ইলেকট্রিক কেটলি, রেডিও, ক্যালকুলেটর, বৈদ্যুতিন খেলনা, চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এমন ছোট যন্ত্র, (ঙ) সিএফএল, এলইডি ও বিভিন্ন প্রকার ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প, (চ) মোবাইল ফোন, জিপিএস যন্ত্র, পকেট ক্যালকুলেটর, কাউটার (ওয়াই-ফাই), প্রিন্টার, টেলিফোন। বিশ্বব্যাপী ই-বর্জ্য বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। আনুমানিক ৭৫ শতাংশ ই-বর্জ্য কী করা হবে, কোথায় ফেলা হবে এই ভাবনায় বাড়ি, অফিস এবং অয়্যার হাউসগুলোতে পড়ে থাকে অন্যান্য বাতিল জিনিসপত্রের সঙ্গে।

গ্লোবাল ই-ওয়েস্ট মনিটর ২০১৪-র রিপোর্ট আরও জানিয়েছে— সারা পৃথিবীতে ৪১.৮ মিলিয়ন টন বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিন (ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক ইক্যুইপমেন্ট) আবর্জনা তৈরি হয়েছে। যার মধ্যে ১ মিলিয়ন টন ল্যাম্প; ৬.৩ মিলিয়ন টন বিভিন্ন প্রকার স্ক্রিন; মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, পারসোনাল কম্পিউটার, প্রিন্টার ৩ মিলিয়ন টন; ১২.৮ মিলিয়ন টন ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, মাইক্রোআভেন, টোস্টার, ইলেকট্রিক সেভার ও ভিডিও ক্যামেরা; ১১.৮ মিলিয়ন টন ওয়াশিং মেশিন, ডিশ ওয়াশার, ইলেকট্রিক স্টোভ, সৌরকোষের প্যানেল এবং ৭ মিলিয়ন টন ফ্রিজ, এসি সহ ঠাণ্ডা করার যন্ত্র। এই বর্জ্য ২০১৮-তে দাঁড়াবে প্রায় ৫০ মিলিয়ন টন অর্থাৎ বার্ষিক বৃদ্ধি ৪-৫ শতাংশ। দিল্লিতে অবস্থিত তথ্য এবং প্রযুক্তি দপ্তরের বিজ্ঞানী (ই) ড. এস চট্টোপাধ্যায় ইলেকট্রনিক ওয়েস্ট অ্যান্ড ইন্ডিয়া গবেষণাপত্রে (২০১১) উল্লেখ করেছিলেন, সবদিক থেকে বিবেচনা করে ভারতে ২০১৫-তে বৈদ্যুতিন বর্জ্যের পরিমাণ হবে ০.৭ মিলিয়ন টন, যা ২০২৫-য় পৌঁছবে ২ মিলিয়ন টনে। ঐ গবেষণাপত্রে বর্জ্য উৎপাদনের নিরিখে দেশের কয়েকটি রাজ্য ও শহরের অবস্থানের উল্লেখ ছিল। এ তো গেল দেশের অভ্যন্তরে ই-বর্জ্যর উৎস। সাম্প্রতিক বণিকসভার সম্মেলনে জানা গেল, সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাতিল হওয়া বৈদ্যুতিন বর্জ্য পদার্থ কিনে নেন প্রধানত ভারত, চীন, ঘানা ও নাইজেরিয়ার ব্যবসায়ীরা। ওই সকল বর্জ্য থেকে রিসাইক্লিং-এর মাধ্যমে ধাতু নিষ্কাশন হল বর্জ্য আমদানির অন্যতম কারণ। পরিবেশবিদদের ভয় ধরাচ্ছে এই কারণটি। এই ভয়কে আরও বাড়িয়ে তুলেছে বেসেল অ্যাকশন নেটওয়ার্কের শুধু কম্পিউটারের ওপর করা এক

সমীক্ষা। ওই সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, বিশ্বে ৫০ মিলিয়ন (১ মিলিয়ন মানে ১০ লক্ষ) কম্পিউটারে ২.৮৭ বিলিয়ন (১ বিলিয়ন মানে ১ হাজার মিলিয়ন) কেজি প্লাস্টিক, ৭১৬.৭ মিলিয়ন কেজি সীসা, ২,৮৬,৭০০ কেজি পারদ থাকে। অপচনশীল প্লাস্টিক, ক্ষতিকারক সীসা, পারদ এবং অন্যান্য ই-বর্জ্য থেকে ক্যাডমিয়াম, ক্লোরিন ও ব্রোমিন সম্বলিত পদার্থ, অ্যাসিড প্রভৃতি রিসাইক্লিংয়ের সময় পরিবেশে মিশে পরিবেশকে দূষিত করবে। বাস্তব সত্য হল, এইসব বিপদ হঠাৎ আসে না। বিপজ্জনক ওই পদার্থগুলো ধীরে ধীরে বাতাস, জল ও খাবারের মাধ্যমে মানুষের শরীরে যায়। যথাযথ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এবং উপযুক্ত নিরাপত্তা নিয়ে রিসাইক্লিং করলে এইসব বিপদ অনেকটা এড়ানো সম্ভব। কেন্দ্র সরকার ১৯৮৬-র পরিবেশ আইনের অধীনে ই-ওয়েস্ট (ম্যানেজমেন্ট) রুলস ২০১১ পরে ২০১৬ জারি করে। ই-ওয়েস্ট (ম্যানেজমেন্ট) রুলস ২০১৬ সঠিকভাবে কার্যকর করা যায় নি। যদিও এই আইন চালু হয়েছে ১ অক্টোবর ২০১৬ থেকে।

বিশ্বে ৫০ মিলিয়ন কম্পিউটারে ২.৮৭ বিলিয়ন কেজি প্লাস্টিক, ৭১৬.৭ মিলিয়ন কেজি সীসা, ২,৮৬,৭০০ কেজি পারদ থাকে। অপচনশীল প্লাস্টিক, ক্ষতিকারক সীসা, পারদ এবং অন্যান্য ই-বর্জ্য থেকে ক্যাডমিয়াম, ক্লোরিন ও ব্রোমিন সম্বলিত পদার্থ, অ্যাসিড প্রভৃতি রিসাইক্লিংয়ের সময় পরিবেশে মিশে পরিবেশকে দূষিত করবে।

নতুন করে আসা এই আইনে ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদনকারী সংস্থাকে 'এক্সটেনডেড প্রডিউসার রেসপনসিবিলিটি'-র আওতায় আনা হয়েছে। প্রস্তুতকারক ও উৎপাদককেই ইলেকট্রনিক বর্জ্য সংগ্রহ করে তা তুলে দিতে হবে স্বীকৃত এজেন্সির কাছে। প্রস্তুতকারক ও উৎপাদক ছাড়াও ঐ আইনে ডিলার, গ্রাহক, স্থানীয় বা পুর কর্তৃপক্ষ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং রাজ্য সরকারের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা আছে। কিন্তু ই-ওয়েস্ট (ম্যানেজমেন্ট) রুলস ২০১৬-তে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে— যে সমস্ত কারখানা, দোকান, অফিস, ইলেকট্রনিক পণ্যের উৎপাদক প্রভৃতি যাঁরা বেশি পরিমাণে ইলেকট্রনিক বর্জ্য তৈরি করেন (বাল্ক জেনারেটর) তাঁরা একমাত্র দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভেন্ডরকেই তা দিতে বা বিক্রি করতে পারবেন। যে সমস্ত সংগ্রাহকের এই লাইসেন্স থাকবে, তাঁরাই একমাত্র এই সকল ইলেকট্রনিক বর্জ্য সংগ্রহ বা কিনে নেওয়ার অধিকারী হবেন। এর উদ্দেশ্য হল, কোনোমতেই যাতে ইলেকট্রনিক বর্জ্য অসংরক্ষিত ক্ষেত্রে চলে না যায়। লাইসেন্সপ্রাপ্ত সংগ্রহকারীকে দেওয়ার অর্থ হল, সেই ইলেকট্রনিক বর্জ্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত সংগ্রহকারীর কাছ থেকে একমাত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিসাইক্লিং চ্যানেলে যাবে। অসংরক্ষিত ক্ষেত্রে রিসাইক্লিং হবে না। এই আইনে ই-বর্জ্যর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার উল্লেখ রয়েছে। অনেক বাস্তব বাধা, জটিলতা, উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব, উদ্যোগহীনতা ও অসচেতনতা এই আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে উঠছে। সে ক্ষেত্রে 'প্রিন্সিপল্‌স অভ থ্রি আর'স— রিডিউস, রিইউজ এবং রিসাইক্‌ল— পল কনেটের অতি সাধারণ তত্ত্ব প্রাত্যহিক ব্যবহারে ই-বর্জ্য কমাতে অনেকটা সাহায্য করবে। এর পাশাপাশি উৎপাদকদেরও পরিবেশবান্ধব উপাদান, প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পুরানো বৈদ্যুতিন যন্ত্রের সিস্টেম আপগ্রেড করার ব্যবস্থা এবং খারাপ হয়ে গেলে সারানোর যন্ত্রাংশ সহজলভ্য করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশবিদ্‌গণ উৎপাদকদের আর্জি জানাচ্ছেন, 'রি থিঙ্ক প্রোডাক্ট ডিজাইন'। আর ইউরোপের দেশগুলোতে বেশ কয়েক বছর আগেই চালু হয়ে গেছে 'রিডাকশন অব হ্যাজারার্ডস্ সাবস্ট্যান্স' নীতি। আর তা না হলে বর্জ্যের পাহাড় ক্রমশ পর্বতে পরিণত হবে।

প্রতিটা সঙ্কট যেমন সুযোগের জন্ম দেয়, এক্ষেত্রেও উৎপাদক, ব্যবহারকারী, রিসাইক্লার, কেন্দ্র ও রাজ্য দূষণ পর্ষদ, পৌর ও স্থানীয় সংস্থা, জনপ্রতিনিধি রাজনৈতিক দল সকলের মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন এই সঙ্ক ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। যগি তা না হয়, তাহলে পরিবেশের জন্য বাড়বে আরও একটি উদ্বেগ এবং নির্মল বাংলা বা স্বচ্ছ ভারত অভিযান শুধু স্লোগানই হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্রঋণ

বিপন্ন পরিবেশ ২০১৬ — নাগরিক মঞ্চ
https://i.unu.edu/media/unu.edu/.../UNU-1st Global-E-Waste-Monitor-2014-small.pdf
meity.gov.in/writereaddata/files/EWaste_Sep11_892011.pdf

উমা

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো

পূরবী ঘোষ

কখনও কখনও অতি সাধারণ মানুষও অসাধারণ হয়ে ওঠেন তাঁর কোনো একটি কাজের জন্য। ঠিক সেইভাবেই অসাধারণ হয়ে উঠেছেন উলুবেড়িয়ার দৃষ্টিহীন তরুণী স্নিগ্ধা আচার্য। শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমাজ সচেতনতা, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ যখন তৈরি হচ্ছে না, তখন সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন একটি মেয়ে শহর থেকে অনেক দূরে থেকেও নিজেকে একজন সামাজিক দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলেছেন, যা জেনে চমৎকৃত না হয়ে পারি নি।

দৃষ্টিহীন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের স্কুলে রোজ অঙ্ক কষে 'এ আর টাইপ ডিভাইসে'। টেলার ফ্রেমের ওপর ধাতব টাইপ গেঁথে সংখ্যার হিসাবনিকাশ। কেন্দ্রীয় সংস্থা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অভ ভিজুয়্যালি হ্যান্ডিক্যাপ্ড (এনআইভিএইচ)-এর সরবরাহ করা সেই টাইপ পুরোটাই সীসায় তৈরি। আর সেই সীসার ভয়াবহ বিষক্রিয়া যে ছোট্ট শরীরগুলোকে ভেতরে ভেতরে এতটা ধ্বংস করে চলেছে তার হিসাব কে রাখে! সীসা যে অত্যন্ত বিষাক্ত, একথাটা মোটামুটি সবারই জানা আছে। তা সত্ত্বেও বিষয়টি নিয়ে এযাবৎ কেউ মাথা ঘামায় নি। কিন্তু না! সত্যিকারের মাথা যাদের আছে, তারা কেউ কেউ মাথা ঘামায় বৈকি! যেমন ঘামিয়েছেন উলুবেড়িয়ার মেয়ে স্নিগ্ধা আচার্য। তাই রাজ্যের সত্তরটির ওপর ব্লাইন্ড স্কুলে পড়া প্রায় লাখখানেক ছেলেমেয়ের শরীরে আর যেন বিষ না ঢোকে, তারই দাবিতে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন।

স্নিগ্ধা নিজে দৃষ্টিহীন, হলদিয়ার চৈতন্যপুর বিবেকানন্দ আশ্রমে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত স্নিগ্ধা ওই একই পদ্ধতিতে অঙ্ক কষেছেন। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা এইরকম যে, ঘণ্টাখানেক ওই টাইপে অঙ্ক করার পর আঙুলগুলো কালো হয়ে যায়। অনেক সময় টাইপগুলো ফ্রেমে আটকে যায়। তখন ছোটরা দাঁত দিয়ে সেগুলো টেনে তোলে। তাদের কেউ কখনও বারণও করে নি, সাবধানও করে নি। ফলে ওই ছোট্ট শরীরগুলোয় দিনের পর দিন সীসার বিষ ঢুকেই চলেছে।

এই দৃষ্টিহীন তরুণীটি আইনে স্নাতক হওয়ার পর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অভ জুরিডিক্যাল সায়েন্সেস থেকে পাবলিক হেল্‌থ অ্যান্ড মেডিসিন ল-তে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা করেছেন। নিজের পেপারের প্রয়োজনেই তিনি তিনটি ব্লাইন্ড স্কুলের ১২৫ জন পড়ুয়ার ওপর সমীক্ষা চালাতে গিয়ে দেখেন, ৬৫ জনই অনিদ্রা, ক্ষিদে কমে যাওয়া, গ্যাস-অম্বলের সমস্যার শিকার; সর্বোপরি স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যায় ভুগছে। স্নিগ্ধার নিজের ছাত্রাবস্থাতেও এই ব্যাপারগুলো ছিল। দৃষ্টিহীনদের কাছে কত ভালভাবে আইনি সাহায্য পৌঁছে দেওয়া যায় সেই বিষয়টি স্নিগ্ধার গবেষণার বিষয়। এই কারণেই তিনি সমীক্ষা করেছিলেন। সমীক্ষা করতে গিয়ে স্নিগ্ধার মনে হল, এত বড় ভুল হতে দেওয়া যায় না। কয়েক লক্ষ শিশুকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া অন্যায়। তাঁর গবেষণার থেকেও সীসার বিষাক্ত থাবা থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাঁচানোটা অনেক বেশি জরুরি বলে তাঁর মনে হয়েছে। তাই তিনি আইনের পথে গিয়ে মামলা করলেন। তাঁর আইনজীবী শ্রীকান্ত দত্তের মন্তব্য, 'স্নিগ্ধা চান আগামী প্রজন্ম সীসার বিষাক্ত থাবা থেকে রেহাই পাক।' আদালতে ওঁর আর্জি, এনআইভিএইচ-কে বিকল্প কিছু ভাবতে বলা হোক। কারণ এই এ আর টাইপগুলোতে ৯৮.১১ শতাংশ সীসা রয়েছে।

স্নিগ্ধার এই সন্দেহ যে ঠিক, তাতে সিলমোহর দিয়েছেন চিকিৎসকেরাও। তাঁরাও মনে করেন, মানবদেহে সীসার বিষক্রিয়া ভয়াবহ। এই বিষক্রিয়ার ফলে স্নায়ু, পেশি, পেট ও ত্বকের সমস্যা দেখা দিতে পারে। দৃষ্টিহীন শিশুরা স্কুলজীবনে প্রতিদিন অন্তত দেড়-দু ঘণ্টা সীসার সংস্পর্শে থাকে। তাদের মধ্যে যে সকল শারীরিক উপসর্গ দেখা যায়, সেগুলি সীসার বিষক্রিয়ার ফল বলে মনে করছেন কলকাতার

মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিনের শিক্ষক-চিকিৎসক সোমনাথ দাস।

দৃষ্টিহীন এই তরুণী আইনজীবীর এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইন্ড বয়েজের অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, স্নিগ্ধার এই মামলায় যদি ইতিবাচক কোনও পরিবর্তন হয় তাহলে আগামী প্রজন্ম দারুণ উপকৃত হবে। রাজ্যের অন্যান্য ব্লাইন্ড স্কুলের প্রধানরা স্নিগ্ধার এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাদের পাশাপাশি আমরা স্নিগ্ধার এই পদক্ষেপকে শুধু সাধুবাদই জানাচ্ছি না, চাইছি তার সর্বাঙ্গীন সাফল্য। তাঁর জন্য রইল আমাদের অজস্র অভিনন্দন, শুভেচ্ছা।

সূত্রঋণ 'এই সময়', ১০ নভেম্বর, ২০১৭

এ এক অভিনব প্রীতিভোজ

গত ২১ জানুয়ারি ২০১৮ হরিণঘাটা-র কাছে নারায়ণপুর গ্রামে এক অভিনব প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান হয়ে গেল। শীতের রোদ পিঠে লাগিয়ে হাতা গুটিয়ে কব্জি ডুবিয়ে পোলাও-কালিয়া-মুরগি-মাটন খেয়ে ঢেঁকুড় তোলা পিকনিক নয়, এই প্রীতিভোজের মেনু ছিল খিচুড়ি আর লাবড়া শেষ পাতে দু-একটা রসগোল্লা। এই প্রীতিভোজের আয়োজন করেছিল নারায়ণপুর গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব সমিতি। এবারেই প্রথম এই প্রীতিভোজ বা ক্রীড়া উৎসব-এর কদিন পরেই নারায়ণপুর স্কুল-এর মাঠেই অনুষ্ঠিত হল। এই প্রীতিভোজটি অভিনব এই কারণে যে উদ্যোক্তারা চেয়েছিলেন মার্কারির চেয়ে দ্রুতগতিতে নেবে যাওয়া মূল্যবোধ-এর শিক্ষা গ্রামের মানুষের ভেতর ছিটেফোঁটা ফিরে আসুক। প্রীতিভোজের খরচ কি ভাবে উঠবে। এর জন্যে চার-পাঁচটা খুপরির ভেতর রাখা ছিল কাগজের বাক্স। খাওয়ার পর যে যার সাধ্যমত দান করবেন। কেউ কিন্তু নিজেরটা ছাড়া অন্য কেউ কতটা ছাড়ল তা জানবে না। একটা মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা আর কি। চারপাশের গ্রামের ছেলে, বৌ, মেয়ে বুড়ো সব্বাই প্রীতিভোজে অংশ নিলেন। একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। এই ক্রীড়া উৎসব সমিতির জন্ম কথা ভারি অদ্ভুত। প্রায় ৩৭ বছর আগে এই গ্রামে উৎস মানুষ পাঠচক্র গড়ে ওঠে। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রী নিরঞ্জন বিশ্বাস ও সতীশ মণ্ডল। সেই পাঠচক্র থেকেই জন্ম নেয় আজকের নারায়ণপুর গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব সমিতি। এক্কেবারে স্থানীয় ভাবে কোনও সরকারি বা বেসরকারি অনুদান ছাড়াই, কেবল শুভানুধ্যায়ীদের সাহায্য সম্বল করে এত বছর পরেও সমিতি যে ক্রীড়া উৎসব চালিয়ে যেতে পারছে তা বেশ অভিনব বৈকি! নারায়ণপুর গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব সমিতির এই উদ্যোগ এ রাজ্যে একটি রোল মডেল। যদিও টিভির ক্যামেরা বা সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা এখানে আসেন না তবু আমাদের আশা যে এলাকার অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা নারায়ণপুর গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব সমিতির হাল ধরবে।

বেশ কিছু গ্রাহক আমাদের জানিয়েছেন যে, তাঁরা ডাকে উৎস মানুষ পাচ্ছেন না। পত্রিকা পাঠাবার ব্যাপারে আমরা সরকারি ডাক বিভাগের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। বিষয়টি নিয়ে ডাক বিভাগে অভিযোগ জানানো হয়েছে। যাঁরা পত্রিকা পান নি তাঁরা বইমেলায় উৎস মানুষ স্টলে (৪০৭) এসে নির্দিষ্ট সংখ্যাটি থাকলে নিয়ে যেতে পারেন।